মডিউল-৩

ইউনিট-৪

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

অধিবেশন-১ : যুক্তিবাদ ও প্লেটোর শিক্ষাদর্শন

অধিবেশন-২ : প্রকৃতিবাদ ও রুশোর শিক্ষাদর্শন

অধিবেশন-৩ : ভাববাদ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন

অধিবেশন-৪ : প্রয়োগবাদ ও জন ডিউই-এর শিক্ষাদর্শন

অধিবেশন-৫ : উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

অধিবেশন-৬ : মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ : আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৫৭) ও শরীফ কমিশন (১৯৫৯)

অধিবেশন-৭ :জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং জাতীয় পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬)

অধিবেশন-৮ : বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)

অধিবেশন-৯ : বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪)

ইউনিট-৪ অধিবেশন-১

যুক্তিবাদ ও প্লেটোর শিক্ষা দর্শন

ভূমিকা

প্লেটো মূলত ভাববাদী দার্শনিক হলেও যুক্তির মাধ্যমে ভুল ধারণাকে খন্ডন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিই বেছে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ জ্ঞান যে ভ্রান্ত ও মিথ্যা এই বিষয়ে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন তাঁর জ্ঞান মতবাদ শীর্ষক দর্শনে। প্লেটোর মতে জ্ঞানের ভিত্তি যেমন বিশ্বাস নয়, তেমনি জ্ঞানের ভিত্তি মতামতও নয়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, জ্ঞানের ভিত্তি হল প্রজ্ঞা বা যুক্তি। প্লেটো জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষাপাতী। শিশুকে গল্প বলা, খেলাধূলা ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সকল স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- যুক্তিবাদ বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্লেটোর ভাবনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্লেটোর জ্ঞান মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ যুক্তিবাদের ধারণা, শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে প্লেটোর দার্শনিক ভাবনা

যে মতবাদ যুক্তি বা চিন্তাকে যৌক্তিকতার নিরিখে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথবা একটি নির্দেশনা প্রদান করে সেই মতবাদকে যুক্তিবাদ বলা হয়। শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে প্লেটো তিন অংশে ভাগ করেছেন। (১) প্রবৃত্তি, (২) আত্মশক্তি, (৩) বুদ্ধি বা যুক্তি। প্রবৃত্তির গুণ বা ধর্ম হচ্ছে মিতাচার, শক্তির ধর্ম হচ্ছে সাহস এবং যুক্তির ধর্ম হচ্ছে পান্ডিত্য। প্লেটো সমাজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। শ্রেণীগুলো হল- (১) শ্রমজীবী, (২) যোদ্ধা, (৩) দার্শনিক। শ্রমজীবী শ্রেণী নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা বহুল পরিমাণে পরিচালিত হবে। যোদ্ধা শ্রেণীর চরিত্রে শক্তির প্রভাব বেশি থাকবে। আর দার্শনিক শ্রেণীর মধ্যে অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নের ছকের প্রশ্নসমূহের উত্তর 'কী (Key) পয়েন্ট'-এর মাধ্যমে দিতে চেষ্টা করুন।

প্লেটোর মতে—	
১. শ্রমজীবী কারা?	
২. যোদ্ধা কারা?	
৩. দার্শনিক কারা?	

পর্ব-খঃ প্লেটোর জ্ঞান মতবাদ

প্লেটোর মতে জ্ঞানের তিনটি স্তর রয়েছে- (১) ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরিত জ্ঞান (২) মতামতের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান, (৩) প্রজ্ঞা বা যুক্তির মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান। ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরিত জ্ঞান মানুষকে প্রায়শ প্রতারিত করে এবং পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে। আর মতামতের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই এ ধরনের জ্ঞানকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। কাজেই প্লেটোর মতে এ দুটি জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। প্রজ্ঞা বা যুক্তির মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানকে প্লেটো প্রকৃত জ্ঞান বলেছেন। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা মতামতের ভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয় না বরং ইহা শাশ্বত ও চিরন্তন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন 'কী (Key) পয়েন্ট' উদাহরণ-এর মাধ্যমে নিম্নের ছকটি পূরণ করি।

১. ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরিত জ্ঞান	১.	২.
২. মতামতের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান	১.	২.
৩. প্রজ্ঞা ও যুক্তির মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান	১.	২.

পর্ব-গঃ পে-টোর শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

পে-টোর মতে সকল স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে। তার মতে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে বিশ বৎসর পর্যন্ত। তারপর একুশ থেকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্লেটো শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যাপারে গল্প বলা, খেলা ও আদর্শ অনুসরণের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার নিম্নে প্লেটোর শিক্ষাক্রমের বিষয় শীর্ষক ক্ষেত্র থেকে প্রত্যেকটি (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা) স্তরের জন্য একটি বিষয় নির্বাচন করুন যে বিষয়টি ইতোমধ্যে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এবং কেন? দুই বাক্যে লিখুন।

প্লেটোর শিক্ষাক্রমের বিষয়

নৃত্য, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য শিক্ষা,
পাটিগণিত, উচ্চতর গণিত, শরীর চর্চা
দর্শন, বীরদের কথা, গল্প, উচ্চতর জ্যামিতি, সংগীত
ক্রীড়া, জ্যামিতি, সামরিক শিক্ষা, জ্যোতির্বিদ্যা,
জাতীয় ইতিহাস

প্রাথমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা	উচ্চ শিক্ষা
বিষয়ঃ ১. ২.	বিষয়ঃ ১. ২.	বিষয়ঃ ১. ২.

ইউনিট-৪ অধিবেশন-১

মূল শিখনীয় বিষয়

যুক্তিবাদ ও প্লেটোর শিক্ষাদর্শন

যে মতবাদ যুক্তি বা চিন্তাকে যৌক্তিকতার নিরিখে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথবা একটি নির্দেশনা প্রদান করে সেই মতবাদকে যুক্তিবাদ বলা হয়। প্লেটো, এ্যারিস্টটল, বার্ট্র্যান্ড রাসেল, দেকার্ত প্রমুখ যুক্তিবাদী দার্শনিক।

গ্রীসের এথেন্স নগরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পে-টো ৪২৮ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরে তিনি উচচমানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান এবং বিশ বছর বয়সে দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আট বছর অর্থাৎ সক্রেটিসের মৃত্যুর আগ পর্যন্ড় তিনি তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। দীর্ঘ বারো বছর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ শেষে তিনি দেশে ফিরে একাডেমী নামক একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। প্লেটো প্রচুর পুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক হলঃ *সিম্পোজিয়াম*, ক্রিটো, রিপাবলিক ও লজ।

প্লেটোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য

প্লেটো চেয়েছিলেন এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্য হবে দেশের মানুষকে সুবিচার বা ন্যায়পরায়ণতার ধারণার সাথে পরিচিত করে তোলা। ব্যক্তি মানুষের সীমিত গন্ডিতে ন্যায়পরায়ণতার প্রতিফলন দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর। সুতরাং ব্যক্তিভিত্তিক ন্যায় পরায়ণতা শিক্ষা দর্শনের সুষ্ঠু আদর্শ হতে পারে না। এ জন্যই প্লেটো সন্ধান করলেন এমন এক সমাজ ব্যবস্থার, যেখানে থাকবে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সুষ্ঠু প্রতিফলন। এই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষার পরিকল্পনা তিনি করলেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'রিপাবলিক'-এ। এই গ্রন্থে প্লেটো ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানব প্রকৃতির তিনটে অংশ আছে। প্রথম অংশ হচেছ প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি বলতে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও জৈবিক তাড়নাকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় অংশ হচেছ আত্মশক্তি। আত্মশক্তি বলতে মানুষের নিজেকে প্রকাশ করা বা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অংশ হচেছ বুদ্ধি বা যুক্তি। এ অংশের কাজ হচেছ অনুধাবন করা ও নির্দেশ দেওয়া। মানব প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পে-টো এর প্রতিটি অংশের বৈশিষ্ট্য বা গুণের কথা

আলোচনা করেছেন। প্রবৃত্তির গুণ বা ধর্ম হচ্ছে মিতাচার, শক্তির ধর্ম হচ্ছে সাহস এবং যুক্তির ধর্ম হচ্ছে বিজ্ঞতা। এই যৌগিক ও জটিল মানব প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এ দ্বন্দ্ব দূর করে মানব প্রকৃতিতে সমন্বয় সাধনের জন্যে প্লেটো ন্যায় ধর্ম প্রবর্তন করেন। তিনি বলেছেন, একজন মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষ বলা যাবে যখন তার যুক্তির অংশ সাহসের সাহায্যে প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করবে।

প্লেটোর সামাজিক শ্রেণী-বিভক্তি

প্লেটো সমাজকে 'শ্রমজীবী', 'যোদ্ধা' এবং 'দার্শনিক' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যারা নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা বহুল পরিমাণে পরিচালিত তারা হচ্ছে শ্রমজীবী শ্রেণীভুক্ত। যাদের চরিত্রে শক্তির প্রভাব বেশি তারা হবে যোদ্ধা শ্রেণীর এবং যাদের মধ্যে অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে, তারা হবে দার্শনিক পর্যায়ভুক্ত। শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকবে, যোদ্ধা শ্রেণীর কাজ হবে দেশ রক্ষা ও যুদ্ধ করা এবং দেশের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকবে দার্শনিক শ্রেণীর উপর। প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর ধর্ম হচ্ছে মিতাচার, যোদ্ধা শ্রেণীর ধর্ম হচ্ছে সাহসিকতা এবং দার্শনিক শ্রেণীর ধর্ম হচ্ছে পান্ডিত্য। মানব প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য যেমন ন্যায় ধর্মের প্রয়োজন, তেমনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন। একটা সমাজকে প্রকৃত ও আদর্শ সমাজ বলা যাবে তখনই, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট শ্রেণীতে তার প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির উপকার সাধন করবে। এরূপ সমাজে দার্শনিক শ্রেণী যোদ্ধা শ্রেণীর সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্লেটোর জ্ঞান মতবাদ

সহজাত প্রবৃত্তিগুলো শিশুর মধ্যে কিভাবে বিকশিত হয় –প্লেটো তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে প্রবৃত্তি এবং শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্ম প্রথমত অভ্যাসের বশবর্তী থাকে, প্রজ্ঞা বা যুক্তির নয়। কারণ জন্মের সময় শিশুর মধ্যে প্রবৃত্তি ও শক্তির ধর্ম প্রবল থাকে এবং প্রকৃতির যুক্তির অংশ অনেক পরে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে শিশু যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তখন তার বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা বিকশিত করা এবং প্রবৃত্তি ও শক্তির উপর প্রজ্ঞা বা যুক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হলো শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। প্রবৃত্তি ও শক্তিকে পরিচালনা করার জন্য নির্ভরযোগ্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা কোথায় পাবে? তা নিয়েও প্লেটো আলোচনা করেছেন। তিনি জ্ঞানের তিনটি স্ড়রের

কথা উল্লেখ করেছেন। সর্বনিম্ন স্তরের জ্ঞান হলো ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরিত জ্ঞান। তাঁর মতে এ স্তরের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। কারণ, ইন্দ্রিয় আমাদেরকে প্রায়শ প্রতারিত করে। জ্ঞানকে যদি শুধুমাত্র ব্যক্তি মনের প্রত্যক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞানের সার্বজনীনতা ও বস্তুনিষ্ঠতাকে ধক্ষংস করে দেওয়া হয়। আর তার ফলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যও ধক্ষংস হয়ে যায়। জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরটি হলো মতামতের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান। কিন্তু এ ধরনের জ্ঞানকেও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মতামত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মতামতকে বরং সামগ্রিক চিন্তার এক একটা অংশ বলা যেতে পারে। এরপর পে- টো তাঁর তৃতীয় স্তরের জ্ঞানের কথা বলেছেন। বিশে- ষণ করলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের এমন কিছু উপকরণ রয়েছে যা মন দ্বারা সংযুক্ত ও সুসংহত হয়ে থাকে। এ সংযোগ ও সুসংহত করার কাজটি করে প্রজ্ঞা বা যুক্তির অংশ। ফলে প্রজ্ঞা বা যুক্তির মাধ্যমেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। একারণে প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শনে বুদ্ধি ও যুক্তিকে উপরে স্থান দিয়েছেন।

প্লেটোর মতে শিক্ষাব্যবস্থা হবে রাষ্ট্র পরিচালিত এবং তিন স্তর বিশিষ্ট ঃ

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা (বিশ বছর বয়স পর্যন্ত) ঃ এই স্তরের প্রথম ছয় বছর প্রধানত স্বাস্থ্য শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংগীত হবে শিক্ষাক্রমের অঙ্গ। এ সময় মা ও ধাত্রীরা শিশুদেরকে যে গল্প বলবে তাও রাষ্ট্র কর্তৃক বাছাইকৃত হতে হবে। ছয় থেকে বিশ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত থাকবে জাতীয় ইতিহাস, বীরদের কথা, শরীর চর্চা, সামরিক শিক্ষা, উচ্চতর সঙ্গীত ও নৃত্য। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে প্লেটো শিক্ষার্থীদের শরীর ও মনের সুগঠিত বিকাশ ঘটানোর পক্ষপাতি ছিলেন।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা (একুশ থেকে ত্রিশ) ঃ যারা প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা পরবর্তী দশ বছর বিজ্ঞান, পাটিগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করবে।

(গ) উচ্চশিক্ষা (একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ) ঃ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় সফল শিক্ষার্থীরা এই স্তরে দর্শন পড়বে। প্লেটো একে 'ডাইলেকটিক' বলেছেন। উচ্চতর গণিত ও জ্যামিতি এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই সময় অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন ভাবে শিক্ষার্থীকে দর্শন চর্চা করতে হবে। পরবর্তী পনের বছর শিক্ষার্থীরা জীবনযাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবে। পঞ্চাশ বছর বয়সের পর থেকে তারা 'পরম

শুভ'র ধ্যানে মগ্ন থাকবে যাতে যখন তাদেরকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে বলা হবে তখন সঠিকভাবে তা নির্বাহ করতে পারে।

শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্লেটো গল্প বলা, খেলা ও আদর্শ অনুকরণের কথা বলেছেন। পরিণত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি প্রধানত ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও দলীয় আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্লেটোর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিকের সকল প্রকার সহজাত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর উপযোগী। তিনি যে গুণের বিকাশ সবার মধ্যে ঘটাতে চেয়েছেন তা হল জ্ঞান অর্জনের অভ্যাস ও যুক্তির ব্যবহার।

মূল্যায়নঃ

১. প্লেটোর জ্ঞান মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

২. প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

কৃষক-শ্রমিক

১. সেনাবাহিনীর সদস্যবর্গ

২. শিক্ষক, গবেষক, শাসক শ্রেণী

পর্ব-খ ও গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৪ অধিবেশন-২

প্রকৃতিবাদ ও রুশোর শিক্ষা দর্শন

ভূমিকা

দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে রুশো ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। তবে তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জ্ঞান অর্জনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাকে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক বলা হয়। রুশো বলেছেন, সমাজের কৃত্রিমতা মানুষকে কৃত্রিম করে তোলে। এই কৃত্রিমতা থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য শিশুর শিক্ষার জন্য তিনি প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত প্রকৃতিই হবে শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আলো বাতাসে শিশু তার শিক্ষা গ্রহণ করবে, তার শিক্ষায় কোন বিধি নিষেধ থাকবে না। এজন্য রুশোর শিক্ষা সম্পর্কীয় মতবাদকে প্রকৃতিবাদ বলা হয়। রুশোর মতে শিক্ষার স্ড়র হবে চারটি। যথা- শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনাগম। তাঁর মতে শিক্ষাদান কার্যে শিশুকে সক্রিয় রাখা, প্রকৃতি থেকে শিখতে শিশুকে সহযোগিতা করাই একজন শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- প্রকৃতিবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার উৎস সম্পর্কে রুশোর মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।
- রুশো নির্ধারিত শিক্ষার স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নারীশিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত রুশোর বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ প্রকৃতিবাদ, শিক্ষার উৎস সম্পর্কে রুশোর মতামত

প্রকৃতিবাদের মূলকথা হলো বিশ্ব প্রকৃতি যা আমরা দেখতে পাই তাই বাস্তব আর সবই মিথ্যা। শিশু তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে। তাতে সমাজের কোন ছাপ থাকবে না। রুশোর মতে শিক্ষার উৎস তিনটি - (১) প্রকৃতি, (২) মানুষ ও (৩) বস্তুজগৎ। শিক্ষকের পক্ষ থেকে উপযাচক হয়ে শিক্ষার্থীকে কোন রকম নির্দেশনা দেওয়াকে রুশো

নেতিবাচক শিক্ষা বলেছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে জোর করে কিছু শেখাবার চেষ্টা না করে আপনা-আপনি শেখার স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে দিতে হবে। আর প্রাকৃতিক ফলাফল সম্পর্কে রুশো বলেছেন শিক্ষার্থী ভুল করলে বা নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রকৃতিই তাকে শাস্ড়ি দেবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

পর্ব-খঃ রুশো নির্ধারিত শিক্ষার স্তর, শিক্ষাক্রম ও নারীশিক্ষা

রুশো শিক্ষার স্তরকে চারটি পর্যায়ে নির্ধারিত করেছেন। (১) শৈশব (১-৫বৎসর), (২) বাল্য (৫-১২ বৎসর), (৩) কৈশোর (১২-১৫ বৎসর), (৪) যৌবনাগম (১৫-২০ বৎসর)। তাঁর মতে প্রথম স্তরে শিশুর শিক্ষা হবে দৈহিক। এই সময় শিশু নিজের কৌতূহলের বশে নিজে যা আবিষ্কার করবে সেটাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। দ্বিতীয় স্তর হলো শিশুর ইন্দ্রিয়সমূহকে সচেতন করার কাল। এ সময়ে ঠেকে যা শিখবে সেটাই তার প্রকৃত শিক্ষা। তৃতীয় স্তর হলো শিশুর জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়টা হচ্ছে শিশুর পরিশ্রমের সময় ও বিদ্যা অর্জনের বয়স। চতুর্থ স্তরে রয়েছে নৈতিক ও হৃদয়ের শিক্ষা। অর্থাৎ প্রথমত দেহ, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়, তৃতীয়তঃ মস্তিষ্ক শিক্ষা শেষে নৈতিক ও হৃদয়ের শিক্ষা। নারীর শারীরিক গঠনকে বিবেচনা করে রুশো নারী শিক্ষাকে আলাদা করে দেখেছেন। তাঁর মতে নারীকে পুরুষের উপযোগী করে গড়ে শিশু লালন পালন, ধর্মজ্ঞান লাভ করাই নারীর প্রধান শিক্ষা।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরের বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়া শেষে উল্লেখিত বিষয়ের উপর তিনটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিম্নের ছকে লিখুন এবং পাশে একবাক্যে উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.	১.

২.	২.
৩.	৩.

পর্ব-গঃ রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতি

রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে একীভূত। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ, শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা, সন্তুষ্টি, স্বাভাবিক পরিবেশের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এসঙ্গে তিনি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিশুকে সক্রিয় রাখা, প্রকৃতি তথা চার পাশের জগৎকে দেখে শিখতে শিশুকে সহযোগিতা করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন।

কাজ-১

প্রিয়_শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এবার আমরা রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতির কোন কোন কৌশল বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রহণ করে শিক্ষাদান করা হচ্ছে "কী (Key) পয়েন্ট" দ্বারা নিম্নের ছকটি পূরণ করি। টিউটোরিয়াল ক্লাসের দিন বন্ধুদের পূরণকৃত ছকের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতির বিভিন্ন দিক

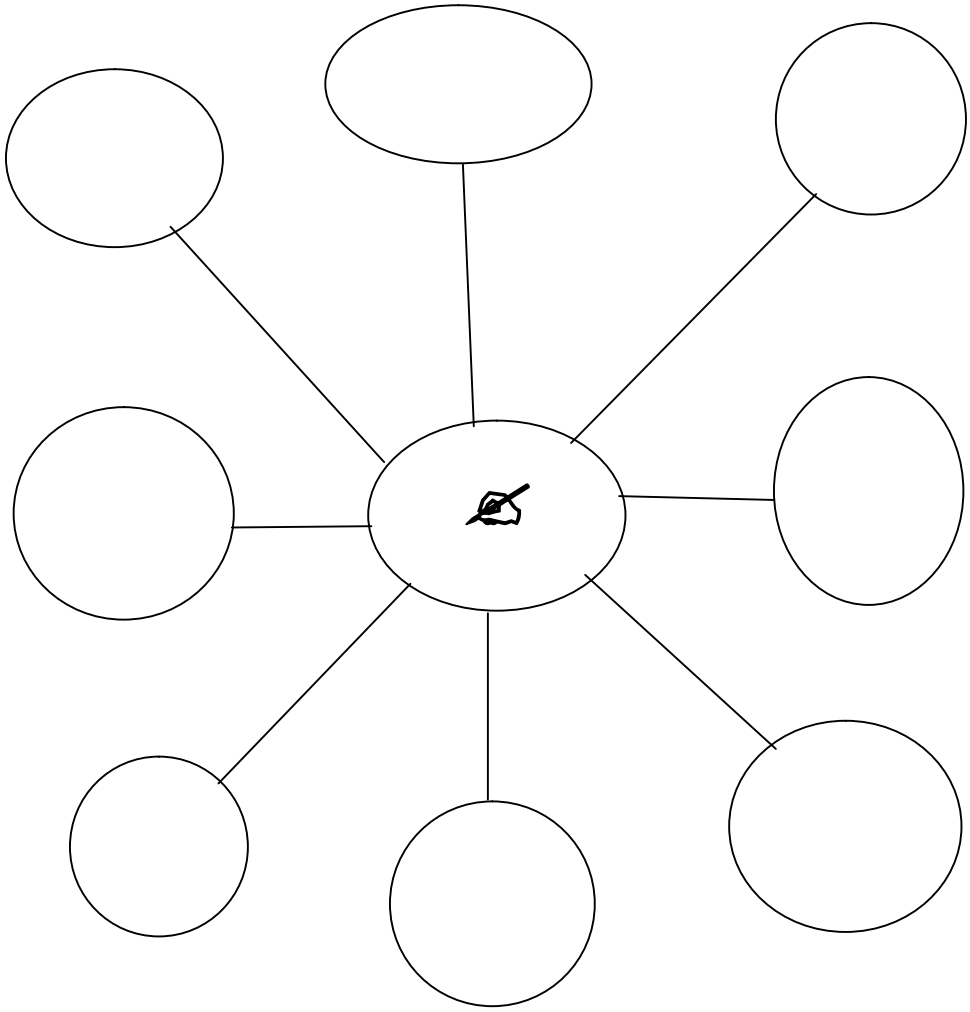

ইউনিট-৪ অধিবেশন-২

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রকৃতিবাদ ও রুশোর শিক্ষাদর্শন

প্রকৃতিবাদ

প্রকৃতিবাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী বিশ্ব প্রকৃতি যা আমরা দেখতে পাই তাই বাস্তব আর সবই মিথ্যা। তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে আত্মপ্রকাশ ও আত্মসংরক্ষণে সাহায্য করা। শিশু তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে। তাতে সমাজের কোন ছাপ থাকবে না। প্রকৃতিবাদীরা কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমের পক্ষপাতি নন। শিক্ষার্থী তার প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করে নেবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে প্রকৃতি থেকে পাঠ গ্রহণ করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবেন মাত্র।

রুশোর বাল্য জীবন ও শিক্ষা জীবন

সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে রুশো ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন ঘড়ি তৈরির কারিগর। রুশো এক সপ্তাহ বয়সেই মাতৃহারা হন। নানা কারণে তাঁর নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ হয়ে ওঠেনি। ছেলেবেলা থেকে প্রচুর গল্পের বই পড়েছেন। মেধার প্রভাবে পরবর্তীকালে মৌলিক লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর উলে-খযোগ্য বই হল 'ডিসকোর্স অন দি অরিজিন অব ইনইকুয়ালিটি', 'পলিটিকাল ইকোনমি', 'সোশাল কনট্রাক্ট' এবং 'এমিল'। উপন্যাসধর্মী পুস্তক 'এমিল' তাঁর শিক্ষাদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। রুশো ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। 'এমিল' বইটির প্রথম ছত্রে তিনি বলেছেন, 'প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তার হাত থেকে যা আসে তার সবই মঙ্গলময়। কিন্তু মানুষের হাতে পড়ে সমস্তই নষ্ট হয়।' তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন করার। শিক্ষার বেলায়ও তিনি বলেছেন স্বভাবের শৃঙ্খলতাকে অনুসরণ করতে। অর্থাৎ তিনি চেয়েছেন সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিমতাকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রকৃতি ও গতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে। তাঁর মতে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাকে বই পড়ানো আর উপদেশ দেওয়া নয়। বরং প্রকৃত শিক্ষা হল শিশুকে তার স্বভাব অনুযায়ী সহজ ও বাধাহীন ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা। এজন্য তিনি শিশুকে শহরের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে সরিয়ে গ্রামের সহজ সরল পরিবেশে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে বলেছেন।

রুশোর মতে শিক্ষার উৎস

রুশোর মতে শিক্ষার উৎস তিনটি - বহিঃ প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নিয়ম, মন প্রকৃতি অর্থাৎ ব্যক্তির স্বভাব এবং জড়প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বিভিন্ন বস্তুর উপর আমাদের অধিকার আছে, আমাদের মনপ্রকৃতিকেও আমরা সংযত করতে পারি। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি আমাদের শাসন বহির্ভূত। জড়প্রকৃতি ও মনপ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রকৃতির অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই রুশোর শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। রুশো আরো দুটি অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। একটি হল **নেতিবাচক শিক্ষা**, অন্যটি **প্রাকৃতিক ফলাফল**।

১. নেতিবাচক শিক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন শিক্ষকের পক্ষ থেকে উপযাচক হয়ে শিক্ষার্থীকে কোন রকম নির্দেশনা না দেওয়াকে।

২. প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, শিক্ষার্থী ভুল করলে বা নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রকৃতিই তাকে শাস্তি দেবে, এক্ষেত্রে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

রুশো 'এমিল' গ্রন্থে এমিল নামক কাল্পনিক শিশুর শৈশব থেকে শুরু করে সংসার জীবনের পূর্ব পর্যন্ত সহৃদয় ও চক্ষুস্মান আদর্শ গৃহশিক্ষকের শিক্ষার ফলে কি করে দেহ, মন, বুদ্ধি ও সামাজিক চেতনায় বিকশিত হল তা বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের চারটি খন্ডে এমিলের বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধি বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পঞ্চম খন্ডে আলোচিত হয়েছে এমিলের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী সোফি'র শিক্ষা পদ্ধতি।

শিশুর স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন -

১. শৈশব (জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর)

২. বাল্য (পাঁচ থেকে বার বৎসর)

৩. কৈশোর (বার থেকে পনের বৎসর)

৪. যৌবনাগম (পনের থেকে বিশ বৎসর)।

শৈশব - প্রথম পর্যায় (১ বছর থেকে ৫ বছর)

শিশু এমিলের শিক্ষা শুরু হবে শহরের চাকচিক্য থেকে দূরে গ্রামের সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে। কারণ শহরের কৃত্রিমতা শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্তরায়। রুশোর মতে এই

সময়টা শিশুর শরীর গঠনের সময়। তাকে প্রকৃতির শ্রীহীনতা সহ্য করে তার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। তাই অতিরিক্ত কাপড় ও অতিরিক্ত আদর তার জন্য নয়। সে খালি পায়ে চলবে এবং অন্ধকারে পথ চলতে বাতি নেবে না। এই সময় শিশু নিজের কৌতূহলের বশে নিজে যা আবিষ্কার করবে তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। শিশুর চিকিৎসার জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। ভয়ংকর জিনিস, ভীতিকর শব্দ, অন্ধকার ঘর এগুলোর সাথে শিশুর পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। তার বায়নার কান্নাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তার খেলনা হবে প্রকৃতি থেকে আহরিত সহজ জিনিস গাছের ডালপালা, ফুল ইত্যাদি। তার সঙ্গে সরল ভাষায় কথা বলতে হবে এবং তাকে শেখানোর জন্য অস্থির হলে চলবে না। শিশুর প্রথম স্তরের শিক্ষা হবে দৈহিক। তার দেহটি সুস্থ সবল কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে গড়ে উঠুক। এ সময় যেটুকু শিক্ষা পাবে তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক হবে। তার শক্তি, বুদ্ধি, সংস্কারকে অবারিত ও অবিকৃত রাখাই এ সময়ের প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় পর্যায় - বাল্য (৫ থেকে ১২ বছর)

রুশো নির্ধারিত শিক্ষাস্তর

বাল্যকালকে রুশো বলেছেন ইন্দ্রিয়সমূহকে সচেতন করবার কাল। প্রকৃতির প্রতি শিশুকে কৌতূহলী করে তুলতে হবে। প্রকৃতির নানা দ্রব্য ও পরিবর্তন শিশু স্বভাবতই লক্ষ করে। এটাই বাস্ড়ব শিক্ষা এবং এ স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে। তাকে এটা কর ওটা করোনা বলা কিন্তু স্বাধীনতা, স্বেচছাচারিতা নয়। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে কষ্ট ভোগ করতে হবে। জানালার কাঁচ ভাঙ্গলে হিমবাতাসে কষ্ট পাবে। সুতরাং পরে আর সেরকম কাজ করবে না। সে ঠেকে যা শিখবে তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। এ সময় তাড়াতাড়ি শেখানোর জন্য অস্থির হলে চলবে না। সময়কে বয়ে যেতে দিতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়- কৈশোর (১২ - ১৫ বছর)

কৈশোর হচেছ পরিশ্রমের সময়, বিদ্যার্জনের বয়স। এ সময় শিশুর মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই সেই ক্ষমতাকে বিদ্যার্জনের কাজে লাগাতে হবে। এ রকম শিক্ষারই সুযোগ তাকে করে দিতে হবে যা তার জীবনে কাজে লাগবে। কায়িক শ্রমের কাজের মধ্যে কাঠের কাজকে রুশো উঁচু স্থান দিয়েছেন। এই বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমিলের সামাজিক শিক্ষাও

শুরু হবে। সে শিখবে সহযোগিতা, শ্রম বণ্টন নীতি ও অর্থনীতির প্রধান স্তরগুলো। কারো ক্ষতি করো না শুধু এই নীতি শিক্ষাই তাকে দিতে হবে।

চতুর্থ পর্যায় - যৌবনাগম (১৫ - ২০ বছর)

এই সময়টা এমিলের নৈতিক শিক্ষার কাল এবং এই সময় জীবনের বিশেষ সংকটপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কাল। এর আগে পর্যন্ত তার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্কের শিক্ষা হয়েছে। এখন শুরু হবে হৃদয়ের শিক্ষা। অর্থাৎ এমিলের অনুভূতিগুলোকে ঔদার্য ও কল্যাণাভিমুখী করে তুলতে হবে। এজন্য সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে পরিচিতি ঘটিয়ে মঙ্গলময় কাজে আকৃষ্ট করতে হবে। তার জন্য তাকে হাসপাতাল, এতিমখানা ইত্যাদিতে নিয়ে মানুষের দুঃখময় জীবনের সাথে পরিচিত করাতে হবে। এখন সে কিছু বই পড়বে যে বইগুলো মানুষকে জানবার শাস্ত্র ও বিজ্ঞান। মানুষের মহত্ত্বের প্রতি আস্থা এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এই হবে তার ধর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তু। এমিলকে এখন যৌনশিক্ষা দিতে হবে। যাতে সে যৌন আকাঙ্ক্ষার নির্মল সুন্দর ও সামাজিকভাবে পরিতৃপ্তির মূল্য বুঝতে পারে। এবার তাকে তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী সোফির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সে দেশ ভ্রমণে বের হবে। এতে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। ফিরে এসে সোফিকে বিয়ে করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করবে।

নারীশিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশো ছেলে ও মেয়েকে এক করে দেখেন নি। তাঁর মতে মেয়েদের শরীরের গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন এবং তাদের কাজও আলাদা। তাই তাঁর নারীর আদর্শ সোফি'র শিক্ষা এমিল থেকে আলাদা। নারীকে তাই পুরুষের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হবে, তার কাজে আসতে হবে এবং তাকে খুশী করতে শিখতে হবে। নারীকে শিশুর যত্ন ও লালন পালনের কৌশল জানতে হবে, নিজেকে সমাজের জন্য গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। সোফি তার মায়ের কাছ থেকে ধর্মজ্ঞান লাভ করবে, মায়ের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে সুনিপুণা হবে এবং সব সময় হাসিখুশী থাকবে, নিজেকে যেন সুন্দর দেখায় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তাঁর মতে স্বাভাবিক নারী তার স্বাভাবিক পুরুষ প্রভুর উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে একীভূত। শিশু শিক্ষার এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত দিকগুলো হলো :

শিক্ষাদান পদ্ধতি

১. শিশুর দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুর জন্য শেখা ও শেখানোর আয়োজন করা।

২. শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও প্রত্যক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা।

৩. শিক্ষা লাভে শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ও তৃপ্তি লাভের প্রতি নজর রাখা।

৪. শিক্ষাদান ব্যবস্থায় স্বাভাবিকতা বজায় রেখে শিশুকে তার চারপাশের জগতের উপযোগী করে তোলা।

৫. শিক্ষাদানে শিক্ষকের কোন সক্রিয় ভূমিকা না রাখা। শিশুকে সক্রিয় রাখা। চারপাশের জগৎকে দেখে শুনে ও বিচার করে শিখতে সহযোগিতা করা।

৬. পুরুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে নারী ও শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয় করা।

মূল্যায়নঃ

১. রুশোর মতে শিক্ষার উৎস কী? নেতিবাচক শিক্ষা ও প্রাকৃতিক ফলাফল বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন?

২. রুশোর শিক্ষার স্তর ও শিক্ষাদান পদ্ধতির বিবরণ দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-খ, কাজ-১

১-৩. নিজে প্রশ্ন তৈরি করুন ও নিজে উত্তর লিখুন

পর্ব-গ, কাজ-১

১. খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষা।
২. ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন।
৩. আকর্ষণীয় উপকরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা।
৪. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা।
৫. বার্ষিক শিক্ষা সফর-এর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন।

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৩

ভাববাদ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন কবি হলেও তাঁর বিভিন্ন রচনায় দর্শন প্রচ্ছন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে তিনি শিক্ষার উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ তথা তাঁর আত্মদর্শন থেকেই তাঁর শিক্ষা দর্শনের উৎপত্তি। তাঁর শিক্ষা দর্শনে বিশ্ব মানবতার উদার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের মতে কোলাহল মুক্ত পরিবেশেই মানুষের অর্ন্তনিহিত সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই তিনি শিশুকে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার কথা জোর দিয়ে বলেছেন। শিক্ষকের সহযোগিতায় শিশু দেখে, শুনে, হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- ভাববাদ-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষকের গুণাবলী, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীর শাস্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাস্তবধর্মী ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ ভাববাদের স্বরূপ

ভাববাদীদের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে আত্মোপলব্ধি করা এবং এর মধ্যে দিয়ে পরম সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা। ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন সংক্রান্ত নীতির উপর শিক্ষা গ্রহণ করা। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে কান্ট, হেগেল, পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম।

পর্ব-খঃ শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকের গুণাবলী, শিক্ষার্থীর শাস্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকের গুণাবলী এবং শিক্ষার্থীর শাস্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত বক্তব্য রয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, জীবনের যা লক্ষ্য, শিক্ষারও লক্ষ্য তাই। আমরা কী হবো ও কী শিখব এ দুটো কথা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই শুধু ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, শুধু জ্ঞানের শিক্ষাও নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ নির্বাচনে, প্রকৃতি নির্ধারণে এবং ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদী মতাদর্শ অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিখবার সময়, বেড়ে ওঠার সময়, প্রকৃতির সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য এগুলো বেঞ্চ এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বলেছেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের স্কুলে ঠিকমত সম্ভব হয় না। তাই তিনি শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র হিসেবে মেঘ রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলায় তথা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশকে নির্বাচন করেছেন। শিক্ষকের গুণাবলি, শিক্ষক নির্বাচন, আচরণ নির্ধারণ ও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নির্ণয়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। তাঁর মতে, শিক্ষক হবেন আদর্শ স্থানীয়। তাঁদের কাজ হবে পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে হঠাৎ রেগে যাওয়া, আত্মাভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র ও ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাস দোষ, প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করে চলা।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নের ছকে বর্ণিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখুন।

প্রশ্ন		সঠিক উত্তর
১. রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষাকে প্রধান স্থান দিতে হবে?	**১. ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা** **২. জ্ঞানের শিক্ষা** **৩. বোধের শিক্ষা**	
২. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য কোন পরিবেশকে রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেচেন?	**১. শহরের পরিবেশ** **২. প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশ**	

৩. কোনটি একজন শিক্ষকের গুণাবলি নয়?	১. সুবিচারক ২. আত্মাভিমানী ৩. পক্ষপাতিত্বহীন ৪. ধৈর্য্যধারী ৫. প্রসন্নতা ৬. আত্মত্যাগ ৭. আত্মসংযম	

পর্ব-গ : বাস্তব ও জীবন ভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস্তব ও জীবনভিত্তিক তথা কর্মভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীকে কর্মযোগে সক্রিয় রেখে গৃহপালিত পশু পালনে উদ্বুদ্ধ করে, বাগান ও চাষে সহযোগিতা করার মানস গঠনের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে কাজের সম্পর্ক গড়ে তোলাই প্রকৃত শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী এবং সক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতি। শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা প্রয়োগ করতে শিখবে।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনি কী কী পদ্ধতি কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে পারবেন বলে মনে করেন নিম্নে ছকে লিখুন।

বিষয়	পদ্ধতি / কৌশল
বাংলা	১. ২. ৩.
সামাজিক বিজ্ঞান	১. ২. ৩.

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৩

মূল শিখনীয় বিষয়

ভাববাদ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন

ভাববাদ

ভাববাদ দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। ভাববাদীদের মতে এ বিশ্ব এক ভাবমূলক সত্ত্বার অংশ বিশেষ। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য সেই ভাবমূলক পরম সত্ত্বার উপলব্ধি করা। এ দৃশ্যমান জগত তাঁদের কাছে তুচ্ছ। তাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়েই পরম সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা। যেহেতু মানুষ আধ্যাত্মিক জীব এবং তার একটা ভাবমূলক সত্ত্বা আছে - তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তাকে ভাবময় জীবন সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া। তাঁদের মতে শিক্ষাক্রম এমন হবে যা মানুষকে আদর্শ জীবনবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে। যুগ সঞ্চিত চিন্তা ও ভাবরাশিই হবে শিক্ষণীয় বিষয়। কাজেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নৈতিক তত্ত্বই হবে শিক্ষার বিষয়বস্তু। আর এসব শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে। কান্ট, হেগেল, পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবল, বার্কলে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী।

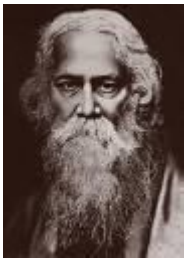

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) ইংরেজি ৭ই মে, ১৮৬১ সালে ভারতের কলকাতা শহরের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বাংলায় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন নামকরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পান। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা তাকে আকর্ষণ করতে না পারলেও পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষকের কাছে এবং পারিবারিক লাইব্রেরির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন করেন। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতে যান। কিন্তু পিতারই আদেশে মাত্র দেড় বছর পরে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত সাহিত্যিক। কিন্তু পুত্র রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার সময় তিনি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলোর সমাধান খুঁজতে গিয়েই তিনি ধীরে ধীরে মহান শিক্ষা দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০১ সালে তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বোলপুর আশ্রমে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই

বিদ্যালয় ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর লাভ করে। ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পরিবেশ, পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত বক্তব্য রয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, জীবনের যা লক্ষ্য, শিক্ষারও লক্ষ্য তাই। আমরা কী হবো ও কী শিখব এ দুটো কথা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তিনি আরো বলেছেন যে, আমরা যা হতে পারি অর্থাৎ আমাদের সম্পূর্ণ গুণের বিকাশ আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের সঙ্গে যুক্ত। মনুষ্যত্ব লাভের মধ্যেই মানুষের চরম বিকাশ ঘটে। তাঁর মতে ভারত বর্ষের সাধনা হচেছ বিশ্বব্রহ্মান্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ স্থাপন করা। তাই শুধু ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, শুধু জ্ঞানের শিক্ষাও নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। তাঁর মতে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুটো অত্যাবশ্যক শক্তি। তাই শিক্ষার্থীকে শিশুকাল থেকেই শুধু স্মরণশক্তির উপর নির্ভরশীল না করে তাদের উপযুক্ত পরিমাণ চিন্তাশক্তির ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

শিক্ষকের গুণাবলি

শিক্ষকের গুণাবলি নির্বাচন, আচরণ নির্ধারণ ও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নির্ণয়েও রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। তাঁর মতে শিক্ষক হবেন আদর্শ স্থানীয়। পরম আদর্শের মূর্ত প্রতিরূপ, যাঁকে অনুসরণ করে ছাত্ররা জীবনের চরম লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, শিক্ষকদের উচিত হবে প্রতিদিন আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের কাছে নিজেদেরকে ভক্তির পাত্র করে তোলা। তাঁদের কাজ হবে পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে হঠাৎ রেগে যাওয়া, আত্মাভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র ও ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাস দোষ, প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করে চলা। কারণ নিজেরা যদি ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করেন তাহলে ছাত্রদের কাছে তাঁদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হয়ে যাবে। তাঁর মতে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। তিনি বলেছেন, যে বিদ্যার সম্পদ যিনি পেয়েছেন তাঁর নিজেরই নিস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা।

শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষার পরিবেশ নির্বাচনে, প্রকৃতি নির্ধারণে এবং ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদী মতাদর্শ অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিখবার সময়, বেড়ে ওঠার

সময়, প্রকৃতির সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, নির্মলবায়ু, মুক্তজলাশয়, উদার দৃশ্য এগুলো বেঞ্চ এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বলেছেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের স্কুলে ঠিকমত সম্ভব হয় না। তাই তিনি শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র হিসেবে মেঘ রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলায় তথা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশকে নির্বাচন করেছেন।

তিনি শাসন বা শাস্তি্র ক্ষেত্রেও বাইরের হস্তক্ষেপের বা চাপিয়ে দেওয়া শাস্তির বিরোধী। তাই তিনি চেয়েছেন যে, অপরাধ করলে ছাত্ররা ভারতীয় প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত্ব পালন করবে। তাঁর মতে শাস্তি পরের কাছ থেকে আসা অপরাধের প্রতিফল আর প্রায়শ্চিত্ত্ব হল নিজে অপরাধের সংশোধন করা। তিনি আরো বলেছেন যে, দন্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করলে যে গ-ানি মোচন হয় না এ শিক্ষা শিশুকাল থেকেই হওয়া দরকার। তাঁর মতে অন্যের কাছে নিজেকে দন্ডনীয় করার হীনতা মনুষ্যচিত নয়। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিদ্যালয়কেও শিক্ষার্থীর স্বভাবধর্মের অনুসারী হতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মতে ছোট শিশুকে যদি ছোট শিশু হতে দেওয়া যায়, সে যদি খেলার, দৌড়ানোর, কৌতূহল মেটানোর সুযোগ পায় তাহলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, তাকে বের হতে দেবো না। খেলায় বাধা দেবো, ঠান্ডা ঘরে বসিয়ে রাখব, তাহলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহলে ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির মাধ্যমে যে ভার নিজে অনায়াসে বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপর পড়ে। ফলে শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীকে কর্মযোগে সক্রিয়করণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সাথে কর্মযোগে সক্রিয় করার ব্যবস্থার কথাও বলেছেন। তাই তিনি বলেছেন যদি সম্ভব হয় তা হলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকবে। এই জমি থেকেই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য আসবে এবং চাষের কাজে ছাত্রেরা সাহায্য করবে। ছাত্রেরা গরু পালনেও সাহায্য করবে এবং অবসর সময়ে নিজেরা বাগান করবে। এইভাবে তারা প্রকৃতির সঙ্গে কাজের সম্পর্ক পাতাতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কাজগুলো পাশ্চাত্যের প্রয়োগবাদী ধারা কর্তৃক প্রবর্তিত প্রজেক্টগুলোর মতো কৃত্রিম বা বাস্তব কর্মের অনুরূপ কর্ম নয় বরং বাস্তব কর্মই, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট

অঙ্গ। তাই তিনি বলেছেন যে, লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ সমস্ড় কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের উপর দেয়া উচিত।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

তিনি বলেছেন যে, শিক্ষার্থীদেরকে অল্প অল্প করে শেখাতে হবে এবং তারা যখন যেটুকু শিখবে তখনই তা প্রয়োগ করতে শিখবে। এ ভাবে যদি শেখানো যায় তা হলে শিক্ষা তার কাছে ভার হবে না বরং সে শিক্ষাকে ব্যবহার করে ভার লাঘব করতে পারবে। শুধু শ্রেণী বহির্ভূত নয়, শ্রেণী পাঠের ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি 'প্রত্যক্ষ পদ্ধতি' প্রয়োগ করেছেন। এ পদ্ধতি তিনি বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত সব ভাষার বেলাতেই ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর ইংরেজি শ্রুতি শিক্ষা বইটিতে বলেছেন যে, যে সব শিক্ষার্থীদের মাত্র অক্ষর পরিচয় হচেছ তাদেরকে কানে শুনিয়ে ও মুখে বলিয়ে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যই বইটি লেখা হয়েছে। বইটির এক একটি অংশ ছাত্রেরা যখন কানে শুনে পুরোপুরি বুঝতে পারবে তখনই তাদেরকে দিয়ে মুখে বলাতে হবে। যেমনঃ শিক্ষক যখন বলবেন, Come. তখন ছাত্র I come বলে তাঁর কাছে আসবে। আবার যখন বলবেন, Go. তখন I go বলে চলে যাবে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে বড় বাক্যে দেয়া নির্দেশ পালন করা শেখাতে বলেছেন। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন যার নাম তিনি দিয়েছিলেন স্থানিক তথ্য সন্ধান। এই পদ্ধতিতে ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কোন বিশেষ স্থানের বা অঞ্চলের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করবে, বিভিন্ন স্থানের জমির উৎপাদিকা শক্তি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিরও খোঁজ করবে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে কী শ্রেণীকক্ষে, কী শ্রেণীর বাইরে, শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখতে ও তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে সমন্বয়বাদী দার্শনিক বলা যায়। কারণ তিনি শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভাববাদী, পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী।

মূল্যায়নঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার লক্ষের ক্ষেত্রে ভাববাদী, শিক্ষায় পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী - বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-খ, কাজ-১

১. বোধের শিক্ষা, ২. প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশ, ৩. আত্মাভিমানী

পর্ব-গ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৪ অধিবেশন- ৪

প্রয়োগবাদ ও জন ডিউই-এর শিক্ষা দর্শন

ভূমিকা

জন ডিউই একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক। তিনি প্রয়োগবাদী দার্শনিক হলেও পৃথিবীর নিত্য পরিবর্তিত বিষয়কে মেনে নিয়েই বিবর্তনবাদ, প্রয়োগবাদ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমন্বয়ের উপরই তার শিক্ষাদর্শন গড়ে উঠেছিল। জীবন অভিজ্ঞতার দর্শনই তাঁর শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি। সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন, সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়, শিশুর ব্যক্তিগত ও সমাজের চাহিদার আলোকে শিক্ষাক্রমের বিন্যাস, সর্বোপরি কর্মতৎপর শিশুকে বাস্তব কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে তথা সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করাই জন ডিউই-এর শিক্ষা দর্শনের মূলকথা।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- প্রয়োগবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডিউই -এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডিউই-এর শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডিউই -এর মতে শিক্ষাস্তর বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডিউই-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ প্রয়োগবাদের ধারণা

ভাববাদ, জড়বাদ ও প্রকৃতিবাদের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি কাটিয়ে তুলতেই প্রয়োগবাদের আবির্ভাব। প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতে সকল কিছুর সত্যতা প্রমাণের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাঁরা উপযোগিতা, বাস্তবতা ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানব সমাজের সমস্যা সমাধানের বিষয়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিককর্মে

নিয়োগপূর্বক জীবনের মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। আর শিক্ষাক্রম হবে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও সমাজের চাহিদা মোতাবেক।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সমাজের চাহিদা মোতাবেক নবম-দশম শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এরূপ ৫টি বিষয় নিম্নের ছকে উল্লেখ করুন।

শ্রেণী	বিষয়বস্তু
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

পর্ব-খঃ ডিউই-এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাঁর শিক্ষাদর্শন

জন ডিউই -এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ৩টি। যথা- (১) সহজাত ব্যক্তিত্বের বিকাশ, (২) সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জন এবং (৩) বক্তিগতভাবে মানসিক উৎকর্ষতা অর্জন।

ডিউই মূলত একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক হলেও তিনি তার শিক্ষাদর্শন গড়ে তুলেছেন বিবর্তনবাদ, প্রয়োগবাদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমন্বয়ের উপর। তার শিক্ষাদর্শনের বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে :

- শিক্ষা শুধু জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা জীবন যাপনেরই অঙ্গ। শিক্ষা জীবন থেকে কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। কার্যকরী শিক্ষা হবে চলমান জীবনের মতই পরিবর্তনশীল। শিক্ষা সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করবে। শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো পরিবর্তনশীল জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

- শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে জীবন অভিজ্ঞতার দর্শন। ডিউই মনে করতেন যে, শিক্ষা যুগ যুগ ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতারই ফসল। এদিক থেকে শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।
- মানুষের সকল অভিজ্ঞতা আসলে সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। কাজেই সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকা দরকার। সকল বিদ্যালয়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিকীকরণের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই।
- সমাজের প্রয়োজনে স্কুল এবং স্কুলের প্রয়োজনে সমাজ; শিশুর প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনে শিশু। সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য - একটির প্রয়োজনে অন্যটির উন্নয়ন জরুরি। এছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমকে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার আলোকেই বিন্যাস করতে হবে। শিশুর প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাক্রম প্রণীত হতে পারে না। শিশুর সার্বিক উন্নতি সাধন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।
- সামাজিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা উদ্ভূত হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু শিক্ষায় বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকতে হবে। ডিউইর মতে শিশুরা কর্মতৎপর। বাস্তব সমস্যাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলে তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা ও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং এর মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তাই হবে তাদের প্রকৃত শিক্ষা।

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, উপরের বিষয়বস্তুটি মনোযোগ সহকারে পড়াশেষে নিম্নের ছকটিতে কাঠামোবদ্ধ সৃজনশীল ৪টি প্রশ্ন তৈরি করুন :

সৃজনশীল প্রশ্ন
১. জ্ঞান মূলক
২. অনুধাবনমূলক
৩. প্রয়োগমুলক
৪. উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতামূলক

পর্ব-গ: ডিউই-এর মতে শিক্ষাস্তর ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

ডিউই বয়:ক্রম অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তিনটি ধাপে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন। (১) তিন বৎসর থেকে আট বৎসর পর্যন্ত হল খেলা ও পরিবেশ স্তর, (২) আট থেকে বার বৎসর পর্যন্ত হল স্বেচ্ছা প্রণোদিত মনোযোগের স্তর এবং (৩) বার বৎসর ও তার উপরে হল চিন্তামূলক মনোযোগের স্তর। একইভাবে তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ৫টি ধাপে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন। ধাপগুলো হল - (১) সমস্যা উপস্থাপন (২) সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন (৩) সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও সাফল্য (৪) সাধারণ সূত্র গঠন (৫) কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও কৌশল আয়ত্ত করা। জন ডিউই শিশুকেন্দ্রিক বাস্তব শিক্ষার রূপকার। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি মূলত কর্মকেন্দ্রিক। তিনি শিক্ষাদানে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিম্নবর্ণিত ২টি প্রশ্নের উত্তর নিম্নের ছকে লিখুন।

প্রশ্ন : ১. বয়:ক্রম অনুসারে ডিউই শিক্ষার স্তরকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন? ভাগগুলো কী?
২. ডিউই শিক্ষাদান পদ্ধতির স্তরগুলো উল্লেখ করুন।

১.
২.

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৪

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রয়োগবাদ ও জন ডিউই-এর শিক্ষাদর্শন

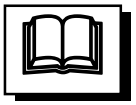

প্রয়োগবাদ

প্রয়োগবাদের মূল কথা হল উপযোগিতা, শিখন ও অর্জনই হলো প্রয়োগবাদের মূল কথা। প্রয়োগবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ মূলত উপযোগিতা, বাস্তবতা, ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে মানব সমাজের উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানে সচেষ্ট হওয়াকে যথার্থ বিবেচনা করেন। তাদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জীবনে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। তাই শিক্ষার্থীকে ঐসব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক কর্মে নিয়োগ করতে হবে যার মাধ্যমে তার জীবনে মূল্যবোধ জাগবে। তাঁদের মতে শিক্ষাক্রম হবে পরিবর্তনশীল। শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সমাজের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষাক্রম তৈরি হবে। তারা মনে করেন যে, শিক্ষা হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর তারা জোর দিয়েছেন বেশি। প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতা ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে প্রকৃতিবাদকে দৃঢ়তর করেছেন। অন্যপক্ষে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শকে বেছে নিয়ে প্রয়োগবাদ সমাজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। দার্শনিক চার্লস পিয়ার্স, জন ডিউই, কিল প্যাট্রিক ও শিলার প্রয়োগবাদের সমর্থক। তাদের মধ্যে জন ডিউই প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে সর্বাধিক খ্যাত।

জন ডিউই-এর শিক্ষা জীবন ও শিক্ষকতা

জন ডিউই ১৮৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্ট প্রদেশের বার্লিংটনে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিউই মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৮৭৯ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় তিনি তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। দুবছর শিক্ষকতা করার পর আবার তিনি ১৮৮০ সালে জনস্ হপ্কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৪ সালে দর্শন বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রভাষক পদে যোগ দেন ও পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করেন। ১৮৯৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দর্শন

নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকসমূহের মধ্যে 'ডেমোক্রেসী এন্ড এডুকেশন', 'দি চাইল্ড এন্ড দি কারিকুলাম', 'স্কুলস অব টুমরো', 'স্কুল এন্ড সোসাইটি' উলে- খযোগ্য।

জন ডিউই -এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ৩টি। যথা-

১. সহজাত ব্যক্তিত্বের বিকাশ
২. সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জন
৩. ব্যক্তিগতভাবে মানসিক উৎকর্ষতা অর্জন

ডিউই মূলত একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক হলেও তিনি তার শিক্ষাদর্শন গড়ে তুলেছেন বিবর্তনবাদ, প্রয়োগবাদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমন্বয়ের উপর। তার শিক্ষাদর্শনের বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে :

- শিক্ষা শুধু জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা জীবন যাপনেরই অঙ্গ। শিক্ষা জীবন থেকে কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। কার্যকরী শিক্ষা হবে চলমান জীবনের মতই পরিবর্তনশীল। শিক্ষা সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করবে। শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো পরিবর্তনশীল জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

জন ডিউই-এর শিক্ষাদর্শন

- শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে জীবন অভিজ্ঞতার দর্শন। ডিউই মনে করতেন যে, শিক্ষা যুগ যুগ ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতারই ফসল। এদিক থেকে শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।
- মানুষের সকল অভিজ্ঞতা আসলে সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। কাজেই সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকা দরকার। সকল বিদ্যালয়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিকীকরণের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই।
- সমাজের প্রয়োজনে স্কুল এবং স্কুলের প্রয়োজনে সমাজ; শিশুর প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনে শিশু। সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য - একটির প্রয়োজনে অন্যটির উন্নয়ন জরুরি। এছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমকে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার আলোকেই বিন্যাস করতে হবে। শিশুর প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে

কোন শিক্ষাক্রম প্রণীত হতে পারে না। শিশুর সার্বিক উন্নতি সাধন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

- সামাজিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা উদ্ভূত হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু শিক্ষায় বাস্ড়ব কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকতে হবে। ডিউইর মতে শিশুরা কর্মতৎপর। বাস্তব সমস্যাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলে তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা ও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং এর মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তাই হবে তাদের প্রকৃত শিক্ষা।

ডিউই বয়:ক্রম অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তিনটি ধাপে বা স্তরে বিভক্ত করেন:

ডিউই নির্ধারিত শিক্ষাস্তর

১. **তিন বছর বয়স থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত ঃ** খেলা ও পরিবেশ স্তর। প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য। এই স্তরে থাকবে ইন্দ্রিয়সমূহের চর্চা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারার ক্ষমতার বিকাশ।

২. **আট থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত ঃ** স্বেচ্ছা প্রণোদিত মনোযোগের স্তর। এই স্ড়রে পরিবেশে প্রাপ্ত বস্তু ও হাতিয়ারের ব্যবহার করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৩. **বার বছর এবং তারও উপরে ঃ** চিন্তামূলক মনোযোগের স্তর। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা আবিষ্কার করবে। সেগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে ও ব্যবহার করবে। এই স্তরে শিখন হবে সযত্ন পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনাকরণ ও কাজের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ডিউই শিক্ষাকর্ম সম্পাদনের জন্য একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি এর নাম দেন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানই একমাত্র প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ প্রকাশ্য ও গভীর বিবেচনাসমৃদ্ধ চিন্তা করে। ডিউইর মতে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিই শিক্ষণ-শিখনের যুক্তিসম্মত পদ্ধতি। ডিউইর শিক্ষাদর্শনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিম্নলিখিত পাঁচটি স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. সমস্যা উপস্থাপন
২. সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন
৩. সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা ও সাফল্য
৪. সাধারণ সূত্র গঠন এবং
৫. কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও কৌশল আয়ত্ত্ব করা।

জন ডিউই শিক্ষাদান পদ্ধতি মূলত কর্মকেন্দ্রিক। তিনি শিক্ষাদানে পরীক্ষণ পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে শিক্ষকের কাজ হবে শিশু কাজে খেই হারিয়ে ফেললে তাকে খেই ধরিয়ে দিতে সহযোগিতা করা।

মূল্যায়নঃ

১. জন ডিউই-এর শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ, কাজ-১

১. বয়:ক্রম অনুসারে ডিউই শিক্ষার স্তরকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন। স্তরগুলো হলো:
   (১) ৩ - ৮ বছর (খেলা ও পরিবেশ)
   (২) ৮ - ১২ বছর (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোযোগ)
   (৩) ১২ - ১২ বছরের উর্ধ্বে (চিন্তামূলক মনোযোগ)

২. ডিউই শিক্ষাদান পদ্ধতির স্তরগুলো হলো :
   (১) সমস্যা উপস্থাপন
   (২) সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন
   (৩) সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা ও সাফল্য
   (৪) সাধারণ সূত্র গঠন
   (৫) কার্য-সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও কৌশল আয়ত্ত করা।

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৫

উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে চার্লস উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডেসপ্যাচ পরবর্তী সময়ে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যতগুলো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে সবখানেই এর কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উডের ডেসপ্যাচে যে দুইটি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো - (১) ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব স্বীকার, (২) প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে চলবে এ সম্পর্কিত চিন্তাপ্রসূত সুপারিশ। ডেসপ্যাচে পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা, জনশিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথার প্রবর্তন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছিল।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- উডের ডেসপ্যাচের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- উডের ডেসপ্যাচের বর্ণিত শিক্ষা বিভাগ গঠন, জনশিক্ষা অধিকর্তার পদ সৃষ্টি ও তার প্রশাসনিক কর্মকান্ড উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে উডের ডেসপ্যাচের প্রস্তাবিত সরকারি অনুদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক ও নারী শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ উডের ডেসপ্যাচের পটভূমি, পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন ও কার্যাবলি

১৮১৩ সালের সনদ আইনে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাটি গৃহীত হবার পর থেকে কুড়ি বছর ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। এই পটভূমিতে ১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনদ আইন নবায়ন করার সময় আসে। এ সময়

ইংল্যান্ডের কমন্স সভা একটি নির্বাচনী কমিটি নিযুক্ত করে ভারত বর্ষের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন। এই অনুসন্ধান কার্যের ভিত্তিতে কোম্পানীর পরিচালক সভা ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই একশত অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি সুদীর্ঘ শিক্ষা দলিল প্রেরণ করেন। এই শিক্ষা দলিলটি উডের ডেসপ্যাচ নামে খ্যাত।

তখন ভারতবর্ষে কোম্পানী অধিকৃত স্থান বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে বিভক্ত ছিল। এই সব স্থানে ছিল প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড এবং কাউন্সিল অব এডুকেশন। তাই নতুন পরিকল্পনায় সমস্ত প্রদেশ থেকে শিক্ষা বোর্ড বা কাউন্সিল তুলে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করা হয়। এই বিভাগ পরিচালিত হবে জনশিক্ষা অধিকর্তার দ্বারা। তার অধীনে থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক। পরিদর্শকগণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করবেন। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয়করণের নীতি প্রবর্তিত হল।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন আমরা নিম্ন বর্ণিত ছকিটি পূরণ করতে চেষ্টা করি।

১. উড ডেসপ্যাচ ঘোষণা কালে ভারতের কোন কোন অঞ্চল কোম্পানীর অধিকারে ছিল?
২. কোন প্রতিষ্ঠান অবলুপ্তি করে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়?
৩. স্কুল ও কলেজ পরিদর্শকগণের প্রধান প্রধান কাজ কী ছিল?

পর্ব-খঃ জনশিক্ষা পরিকল্পনা, সরকারি অনুদান ও অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলি

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত উচচশিক্ষা পরিবেশন ও পরিচালনার জন্য ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তাই উড ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় মূল্যবান প্রস্তাব ছিল ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ডেসপ্যাচে প্রস্তাব করা হয় যে, ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেসব স্থানে লন্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার পর উডের নব প্রকল্পের তৃতীয় স্তরে ছিল ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার জাল বিস্তারের পরিকল্পনা। ডেসপ্যাচে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের স্বপক্ষেও সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়।

জনশিক্ষা পরিকল্পনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল:

১. নিম্নগামী পরিস্রবণ মতবাদের বর্জন

২. মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ এবং

৩. ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে ডেসপ্যাচ অনুদান প্রদানের নির্দেশ দেয়। তবে সরকারি অনুদান পাবার জন্য শুধুমাত্র সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান –

(১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবে। অবশ্য যদি কোথাও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তা উপেক্ষা করা হবে, (২) স্থানীয় পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে, (৩) সরকারি পরিদর্শনের অধিকার স্বীকার করবে ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলবে, (৪) ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নিবে।

সরকারি অনুদান (গ্রান্ট-ইন্-এইড) প্রথায় দেশের সর্বশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমবেশি উপকৃত হয়েছিল। তবে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল। অনুদান মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: (১) শিক্ষকরা যাতে বেতন পান সে জন্য তার কিছু অংশ সাহায্যরূপে দান, (২) নির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্ট হারে সাহায্য দান, (৩) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দান।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন আমরা নিম্নে বর্ণিত ছক থেকে সঠিক শব্দ / বাক্য বাছাই করে যথাযথ বিভাগে লিখতে চেষ্টা করি।

ইসলামাবাদ, ঢাকা, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, বোম্বে, করাচী, দিল্লী, মাদ্রাজ, শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি, নিম্নগামী পরিস্রবন নীতি, স্কুল পরিদর্শন নীতি, সরকারী পরিদর্শনের নির্দেশ থাকা, সরকার থেকে ছাত্রদের বেতন গ্রহণ, ছাত্রদের থেকে সামান্য বেতন গ্রহণ, স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা, ধর্মীয়ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা।

উডের ডেসপ্যাচে যেসব স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়	শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ নীতি বর্জন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলি

পর্ব-গঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও উডের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন

ডেসপ্যাচ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল। এই সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান এবং চাকুরীতে নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাধারণ মানুষের বৃত্তিসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য আইন ও চিকিৎসা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করে। ভারতে অধিকসংখ্যক নারী বিদ্যায়াতন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয় এবং অনুদান প্রথার মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়। ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হবার পর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ১৮৬৫ সালের মধ্যে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন, জনশিক্ষা পরিচালক নিয়োগ, পরিদর্শক ও সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এর আগে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিম্নে বর্ণিত ছকে প্রশ্নের পাশের বক্সে দেয়া শব্দগুচ্ছ / সন থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে পাশের খালি বক্সে লিখুন।

প্রশ্ন	শব্দগুচ্ছ	সঠিক উত্তর
১. ডেসপ্যাচে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন?	শিক্ষা প্রশাসন মহাবিদ্যালয়, নর্মাল স্কুল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	
২. কোনটি ডেসপ্যাচে সুপারিশকৃত বৃত্তিমূলক কলেজ?	চারুকলা কলেজ, আইন কলেজ, কৃষি কলেজ	
৩. কত সালে ভারতে প্রথম বারের মত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়?	১৭৫৭, ১৮৫৪, ১৮৫৭, ১৮৬৫, ১৯২১	

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৫

মূল শিখনীয় বিষয়

উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

১৮১৩ সালের সনদ আইনে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাটি গৃহীত হবার পর থেকে কুড়ি বছর ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। এই পটভূমিতে ১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনদ আইন নবায়ন করার সময় আসে। এ সময় ইংল্যান্ডের কমন্স সভা একটি নির্বাচনী কমিটি নিযুক্ত করে ভারত বর্ষের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন। এই অনুসন্ধান কার্যের ভিত্তিতে কোম্পানীর পরিচালক সভা ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই একশত অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি সুদীর্ঘ শিক্ষা দলিল প্রেরণ করেন। এই শিক্ষা দলিলটি উডের ডেসপ্যাচ নামে খ্যাত। ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যতগুলি নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল তন্মধ্যে তৎকালীন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সবকিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উডের শিক্ষা নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি শিক্ষার নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এক কথায় বলা যায় স্বাধীন ভারতে, ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় এবং বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই শিক্ষা সংক্রান্ত্র দলিলে। কোন কোন ঐতিহাসিক এই দলিলের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই দলিলকে ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেছেন। উডের ডেসপ্যাচের লক্ষণীয় দিক হল - (১) ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব স্বীকার (২) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদান কিভাবে চলবে এ সম্বন্ধে চিন্তাপ্রসূত সুপারিশ।

শিক্ষানীতি প্রণয়নে ডেসপ্যাচের প্রভাব

ডেসপ্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

উডের ডেসপ্যাচ পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা, জনশিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথার প্রবর্তন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও নারী

শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর সুপারিশ পেশ করেছিল। ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নতুন পরিকল্পনাটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। পরিকল্পনার প্রথমাংশে ছিল পৃথক শিক্ষা বিভাগের কথা। তখন ভারতবর্ষে কোম্পানী অধিকৃত স্থান বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে বিভক্ত ছিল। এই সব স্থানে ছিল প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড এবং কাউন্সিল অব এডুকেশন। এক একটি প্রদেশের শিক্ষার ভার কয়েকজন মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত এক একটি বোর্ড বা কাউন্সিলের উপর ন্যস্ড় ছিল। ফলে শিক্ষা প্রশাসনে কোন সংহতি ছিলনা। তাই নতুন পরিকল্পনায় সমস্ড় প্রদেশ থেকে শিক্ষা বোর্ড বা কাউন্সিল তুলে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করা হয়। এই বিভাগ পরিচালিত হবে জনশিক্ষা অধিকর্তার দ্বারা। তার অধীনে থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক। পরিদর্শকগণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করবেন। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয়করণের নীতি প্রবর্তিত হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উচচশিক্ষা পরিবেশন ও পরিচালনার জন্য ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তাই উড ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় মূল্যবান প্রস্তাব ছিল ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ডেসপ্যাচে প্রস্তাব করা হয় যে, ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেসব স্থানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার পর উডের নব প্রকল্পের তৃতীয় স্তরে ছিল ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার জাল বিস্তারের পরিকল্পনা। এই শিক্ষা স্তরের উপরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজগুলোর মাধ্যমে প্রসারিত হবে। উচচশিক্ষা স্তরের নিচের দিকে থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো। মাধ্যমিক শিক্ষার নিচে থাকবে প্রাথমিক বা দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করা হবে। ইতোপূর্বে সরকারের নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির ফলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশই কলেজ স্থাপনার জন্যই ব্যয় করা হত। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা

ভীষণভাবে অবহেলিত ছিল। প্রচুর সরকারি অর্থ ব্যয় করে এতদিন কলেজ শিক্ষার মাধ্যমে যে উচচশিক্ষা দিয়ে আসা হয়েছে তাতে সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে আগত মুষ্টিমেয় ছাত্র মাত্রই উপকৃত হয়েছে। তাই ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক যাতে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। ডেসপ্যাচে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের স্বপক্ষেও সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়।

জনশিক্ষা পরিকল্পনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল:

১. নিম্নগামী পরিস্রবণ মতবাদের বর্জন

২. মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ এবং

৩. ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দান।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপরোক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সরকার এককভাবে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পক্ষপাতি ছিল না। তাই ডেসপ্যাচে নীতি গ্রহণ করা হয় যে ভারতীয় জনসাধারণের উপরই শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ব অর্পণ করে সরকার নিজে কিছু অনুদান প্রদানপূর্বক আংশিক দায়িত্ব পালন করবে। এই নীতি গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার দ্রুত প্রসারে সহযোগিতা করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে ডেসপ্যাচ অনুদান প্রদানের নির্দেশ দেয়। তবে সরকারি অনুদান পাবার জন্য শুধুমাত্র সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান –

সরকারী অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা

(১) ধর্ম নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবে। অবশ্য যদি কোথাও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তা উপেক্ষা করা হবে, (২) স্থানীয় পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে, (৩) সরকারি পরিদর্শনের অধিকার স্বীকার করবে ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলবে, (৪) ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নিবে।

সরকারি অনুদান (গ্রান্ট-ইন্-এইড) প্রথায় দেশের সর্বশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমবেশি উপকৃত হয়েছিল। তবে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল।

অনুদান মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) শিক্ষকরা যাতে বেতন পান সে জন্য তার কিছু অংশ সাহায্যরূপে দান, (২) নির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্ট হারে সাহায্য দান, (৩) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দান।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সার্থক শিক্ষাদানে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের একা অভাব সম্বন্ধেও ডেসপ্যাচ উল্লেখ করে। সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করার জন্য ডেসপ্যাচে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এই সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান এবং চাকুরীতে নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ডেসপ্যাচ সাধারণ মানুষের বৃত্তিসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে। আইন, চিকিৎসা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য পৃথক মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। এই সঙ্গে আরো বলা হয় যে, এই সব মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত হবে।

নারী শিক্ষা

ভারতবর্ষের নারী শিক্ষা অনেক পিছিয়ে রয়েছে অথচ নারীশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে জনশিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না—এই উপলব্ধি থেকে ডেসপ্যাচ ভারতে অধিকসংখ্যক নারী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয় এবং অনুদান প্রথার মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়।

ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হবার পর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নর শুরু করা হয়। ১৮৬৫ সালের মধ্যে বাংলা বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ স্থাপন, জনশিক্ষা পরিচালক নিয়োগ, পরিদর্শক ও সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এর আগে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

মূল্যায়নঃ

১. উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশসমূহ বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

১. বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, পাঞ্জাব।

২. প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড ও কাউন্সিল অব এডুকেশন।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে পরামর্শ দান এবং শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান।

পর্ব-খ, কাজ-১

উডের ডেসপ্যাচে যেসব স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়	শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ নীতি বর্জন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলি
কলিকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ	নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি	ধর্ম নিরপেক্ষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালন, স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থা, পরিদর্শকের নির্দেশ পালন, সামান্য ছাত্র বেতন গ্রহণ।

পর্ব-গ, কাজ-১

১. নর্মাল স্কুল

২. আইন কলেজ

৩. ১৮৫৭

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৬

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ : আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৫৭) ও শরীফ কমিশন (১৯৫৯)

ভূমিকা

বৃটিশ উপনিবেশিক ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাধীন দেশের উপযোগী করার নিমিত্তে আকরাম খানের নেতৃত্বে গঠিত পুর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটির (১৯৫২) সুপারিশগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন আতাউর রহমান খান। উল্লিখিত দুইটি কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ বাস্ড়বায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পাকিস্ড়ানের শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য প্রথম কমিশন হল শরীফ শিক্ষা কমিশন। পাকিস্ড়ানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্টে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন এবং ১৯৬০ সালে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। শরীফ শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচচশিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ উল্লেখ করতে পারবেন।
- শরীফ কমিশন গঠন ও মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত শরীফ কমিশনের সুপারিশমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন গঠনের পটভূমি

আকরাম খানের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটির (১৯৫২) সুপারিশগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়িত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে আতাউর রহমান খান-এর সভাপতিত্বে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিম্নের ছকটি পূরণ করি :

১. স্বাধীন রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?	
২. যদি প্রয়োজন থাকে বলে মনে করেন তা হলে কেন - এক বাক্যে লিখুন।	
৩. কত সালে আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়?	
৪. আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?	

পর্ব-খঃ আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ

আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন ৬ বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষা বিভাগ একত্রিকরণ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন, জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষকের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন। এই সঙ্গে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ, হোস্টেলসহ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দশম শ্রেণী পর্যন্ড় বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা, জেলা বোর্ড বিলুপ্তিকরণপূর্বক মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন, মহকুমা পরিদর্শকের গেজেটেড পদ সৃষ্টি, টি টি কলেজ পরিদর্শক সৃষ্টি, ৩ বছর মেয়াদী বি এ ইন এডুকেশন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা এখন আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমিক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশের ক্ষেত্র থেকে বাছাই করে নিম্নের ছকটি পূরণ করি।

৬ বছর মেয়াদী শিক্ষা,
শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষা বিভাগ একত্রিকরণ,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন, জেলা শিক্ষা
অফিসারের পদ সৃষ্টি, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষকের
বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ,
হোস্টেলসহ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দশম শ্রেণী পর্যন্ড় বালিকাদের
অবৈতনিক শিক্ষা, জেলা বোর্ড বিলুপ্তিকরণপূর্বক মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা
বোর্ড গঠন, মহকুমা পরিদর্শকের গেজেটেড পদ সৃষ্টি, টি টি কলেজ পরিদর্শক
সৃষ্টি, সাধারণ বিজ্ঞান, মানবিক, বিজ্ঞান, মাতৃভাষা, সমাজপাঠ, কারিগরি,
কৃষি, চারু ও কারুকলা, বাণিজ্য, ৩ বছর মেয়াদী
বি এ ইন এডুকেশন, শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন।

শিক্ষক	প্রশিক্ষণ	শিক্ষাক্রম	প্রশাসন	শাখা

পর্ব-গঃ শরীফ কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ

১৯৫২ সালে মাওলানা আকরাম খান শিক্ষা কমিটি এবং ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিশন দুটির সুপারিশ সামগ্রিক বাস্তবায়িত না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষে শরীফ শিক্ষা কমিশন (১৯৫৮) গঠন করা হয়। পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্টে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন এবং ১৯৬০ সালে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। শরীফ শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচচশিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেন। মূলত মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র একটি পৃথক শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংস্থারূপে গঠন এবং এ স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে একজন সুনাগরিক, দেশপ্রেমিক, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগের সমর্থ করে তোলাই ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

শরীফ কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ হল :

- মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাবে
- তিনটি উপায়ে স্কুলের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে ঃ (ক) ছাত্র বেতন (৬০% ভাগ), (খ) পরিচালক মন্ডলীর চাঁদা (২০% ভাগ) এবং (গ) সরকারী সাহায্য (২০% ভাগ) হবে।
- শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা কর্মসূচির মৌলিক পরিবর্তন সাধন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মন্ডলীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের উভয় অংশে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- বেসরকারী স্কুলগুলো শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে এবং সেগুলোকে যথার্থ নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এবার আমরা নিম্নের ছকটি পূরণ করি :

১. শরীফ কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে -	
২. শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে হবে -	
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বুঝাবে -	
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী সাহায্যের হার হবে -	
৫. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন -	

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৬

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ ঃ আতাউর রহমান খান শিক্ষা রিপোর্ট (১৯৫৭) ও শরীফ কমিশন (১৯৫৯)

আতাউর রহমান খান শিক্ষা রিপোর্ট

পাকিস্ড়ান সৃষ্টির (১৯৪৭) পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৃটিশ উপনিবেশিক ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাধীন দেশের উপযোগী করার নিমিত্তে আকরাম খানের নেতৃত্বে গঠিত পুর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটির (১৯৫২) সুপারিশগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্ড়ান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন আতাউর রহমান খান। কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছিল। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯০২) রিপোর্ট, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯১৭) রিপোর্ট, হেগ কমিটি রিপোর্ট (১৯২৯), সাপ্রন্ড কমিটি রিপোর্ট (১৯৩৪), সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪) এবং সে সঙ্গে ''পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিশন ১৯৫২" ইত্যাদি। এ ছাড়া কমিশন প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের অভিমত পর্যালোচনা করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা ও সংস্কৃত শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব সুপারিশ করেছিল তার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত সুপারিশগুলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

১. ৫ বছর প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৬ বছর।

২. মাধ্যমিক কোর্সের প্রথম তিন বছর নিয়ে জুনিয়র হাই স্কুল এবং পরবর্তী তিন বছর নিয়ে সিনিয়র হাই স্কুল অথবা পূর্ণ ছয়টি শ্রেণী নিয়ে সিনিয়র হাই স্কুল স্থাপন করতে হবে।

৩. শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা দপ্তর একত্রিত করে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে।

৪. শিক্ষা দপ্তরের অধীন কারিগরি শিক্ষা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. রেঞ্জ ইন্সপেক্টর এর পদ বিলুপ্ত করে তৎপরিবর্তে জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করতে হবে, ইন্সপেক্টর এর সকল দায়িত্ব-কর্তব্য এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

৬. মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

৭. উচ্চ মেধা সম্পন্ন ডিগ্রিধারীকে শিক্ষকতায় আকৃষ্টকরণের জন্য বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং নবীন শিক্ষকবৃন্দকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৯. প্রত্যেক জেলা সদরে হোস্টেল সহ একটি করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বালিকাদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমুখী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে (যেমন- মানবিক, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি)।

১১. জেলা স্কুল বোর্ড বিলুপ্ত করে তৎস্থলে মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড প্রবর্তন করতে হবে।

১২. উন্নত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে মহকুমা পরিদর্শকের গেজেটেড পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১৩. টিটি কলেজ পরিদর্শনের জন্য ইপিএসইএস ক্যাডারের একজন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪. নিম্মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রমে আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হবে – (১) মাতৃভাষা (২) সমাজ পাঠ (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) গণিত (৫) ইসলাম শিক্ষা মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক শিক্ষা (৬) ললিত কলা ও গান (৭) চারু ও কারুকলা (৮) শারীরিক শিক্ষা।

১৫. মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য – (১) মাতৃভাষা (২) সাধারণ বিজ্ঞান, (৩) সমাজ পাঠ ও (৪) চারু ও কারুকলা কোর সাবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১৬. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বহুমুখী কোর্সের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রুপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে – (১) মানবিক (২) বিজ্ঞান (৩) কারিগরি (৪) বাণিজ্য (৫) কৃষি (৬) ললিত কলা (৭) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৮) ইসলাম শিক্ষা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। আর এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের জন্য দরকার প্রশিক্ষণের। শিক্ষা সংস্কার কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নে বর্ণিত সুপারিশগুলো করেছিলেন ঃ

১. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দুই ধরনের হবে ঃ

(ক) সিনিয়র স্কুল পাস শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে তিন বছর

(খ) গ্রাজুয়েটদের জন্য প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে এক বছর।

২. বিষয় ও প্রশিক্ষণ যুগপৎ পরিচালনার জন্য ৩ বছর মেয়াদী বিএ ইন এডুকেশন কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে সঞ্জীবনী কোর্স এবং বিশেষ কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৫. ময়মনসিংহের প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে টিচার কলেজ নামকরণ করা হবে।

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে লাইব্রেরী সাইন্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৭. মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের classical teacher দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে কোন ফি নেওয়া হবে না উপরন্তু প্রশিক্ষণার্থীকে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. যে সব ডিগ্রিধারী শিক্ষকের বয়স ৪০ বছর এবং তার বেশি কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন অথচ ১০ বছরের বেশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং জীবনে কেবলমাত্র একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কেবলমাত্র ঐসব শিক্ষক private প্রার্থী হিসেবে BEd বা সমমানের পরীক্ষা দিতে পারবেন।

১১. Untrained শিক্ষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও প্রশাসন সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করবে।

১৩. মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়িত সুপারিশসমূহ

কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ ৬ বৎসর করার সুপারিশ আজও বাস্তবায়িত হয়নি। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার প্রস্তাবটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া বালিকাদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার প্রস্তাবটি সম্প্রতি বাস্তবায়িত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে বহুমুখী করার সুপারিশটি পাকিস্তান আমলেই বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কিছুদিন তিন বৎসর মেয়াদী বি এ ইন এডুকেশন কোর্সটি চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর-এ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েকটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বি এড (অনার্স) কোর্স চালু আছে।

শরীফ কমিশন রিপোর্ট

ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পূনর্গঠনের লক্ষ্যে সমগ্র পাকিস্ড়ানের চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এস এম শরীফকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৫২ সালে মাওলানা আকরাম খান শিক্ষা কমিটি এবং ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিশন নামে দুটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনগুলোর কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য প্রথম কমিশন হল শরীফ শিক্ষা কমিশন। পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্টে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন এবং ১৯৬০ সালে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। শরীফ শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচচশিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেন।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কীরূপ হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে শরীফ শিক্ষা কমিশন যে রূপরেখা প্রদান করে তাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যকে শরীফ কমিশন নিম্নরূপে প্রকাশ করেছে –

- মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি পর্যাপ্ত শিক্ষাস্তর হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে এবং এই স্তরকে সর্বতোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা হতে স্বতন্ত্র একটি পৃথক শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংস্থারূপে সংগঠন করতে হবে।

- মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে, একজন নাগরিক, একজন কর্মী হিসেবে, একজন দেশ প্রেমিক হিসেবে, প্রকৃত মানবরূপে গড়ে তুলতে হবে। এতে করে সে সামাজিক প্রগতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আত্ম-নিয়োগ করতে সমর্থ হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করেঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ

১. মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং স্বতন্ত্র একটি পৃথক শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংস্থারূপে গঠন করতে হবে।

২. মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে একজন ব্যক্তি, একজন নাগরিক, একজন কর্মী, একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৩. মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাবে, তবে যতদিন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হয় ততদিন ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমান ব্যবস্থায় তিনটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। যথা– ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক, নবম ও দশম মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে থাকবে।

৪. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দশ হতে বারটি বিষয়ে লেখাপড়া করতে হবে।

৫. ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পরবর্তী স্ড়রে ইচ্ছাধীন হবে।

৬. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিল্প যেমন– ধাতব শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, কৃষি, টাইপ রাইটিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি (মেয়েদের জন্য) এবং চারু ও কারু শিল্প প্রবর্তন করা হবে।

৭. ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বছরে রবিবারে, সাধারণ ছুটি, অবকাশ ও পরীক্ষার দিনগুলো ছাড়া ২২৫ পূর্ণ দিবস কার্যকাল হবে এবং বছরে প্রায় ১৬০০ ঘন্টা শিক্ষাদান করতে হবে।

৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ভার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

৯. তিনটি উপায়ে স্কুলের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে ঃ (ক) ছাত্র বেতন (৬০% ভাগ), (খ) পরিচালক মন্ডলীর চাঁদা (২০% ভাগ) এবং (গ) সরকারী সাহায্য (২০% ভাগ) হবে।

১০. শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা কর্মসূচির মৌলিক পরিবর্তন সাধন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মন্ডলীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের উভয় অংশে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১. বেসরকারী স্কুলগুলো শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে এবং সেগুলোকে যথার্থ নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে।

১২. বিজ্ঞান শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কী কী সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে? এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

২. শরীফ কমিশন রিপোর্টে প্রস্তাবিত ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

১. হ্যাঁ
২. স্বাধীন রাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনে।
৩. ১৯৫৭ সালে
৪. সাত

পর্ব-খ, কাজ-১

শিক্ষক	প্রশিক্ষণ	শিক্ষাক্রম	প্রশাসন	শাখা
শিক্ষকের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ, ৩ বছর মেয়াদী বি এ ইন এডুকেশন, শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৬ বছর মেয়াদী শিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, মাতৃভাষা, সমাজপাঠ, চারু ও কারুকলা,	৬ বছর মেয়াদী শিক্ষা, শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষা বিভাগ একত্রীকরণ, জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি, হোস্টেলসহ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জেলা বোর্ড বিলুপ্তিকরণপূর্বক মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন, মহকুমা পরিদর্শকের গেজেটেড পদ সৃষ্টি, টি টি কলেজ পরিদর্শক সৃষ্টি	মানবিক, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, কারিগরি,

পর্ব-গ, কাজ-১

১. উচ্চশিক্ষা হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র
২. সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে
৩. নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী
৪. ২০%
৫. প্রশিক্ষণ

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৭

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬)

ভূমিকা

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা এর সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ঔপনিবেশিক পাকিস্তানের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করে একটি আধুনিক অসাম্প্রদায়িক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি ১৯৭৪ সালে সরকারের নিকট পেশ করেন। কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করে। ১৯৭৬ সালে এই কমিশনের সুপারিশমালা বাস্ড়বায়ন এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যথাযথ পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রথমে প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক পরে প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)-এর গঠন এবং কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) -এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬) -এর গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) -এর গঠন ও কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা এর সভাপতিত্বে গঠিত হয়। কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা, অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা -এই দুটি ধারায় বিভক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারা চালু কোন উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা নিম্নের ছকে দুই বাক্যে লিখুন।

১.

২.

পর্ব-খঃ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) -এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য আপনার মতে কী কী সুপারিশ থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? তা 'কী (Key) পয়েন্ট'-এর মাধ্যমে নিম্নের ছকে লিখুন। পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ-এর সাথে মিলিয়ে দেখুন।

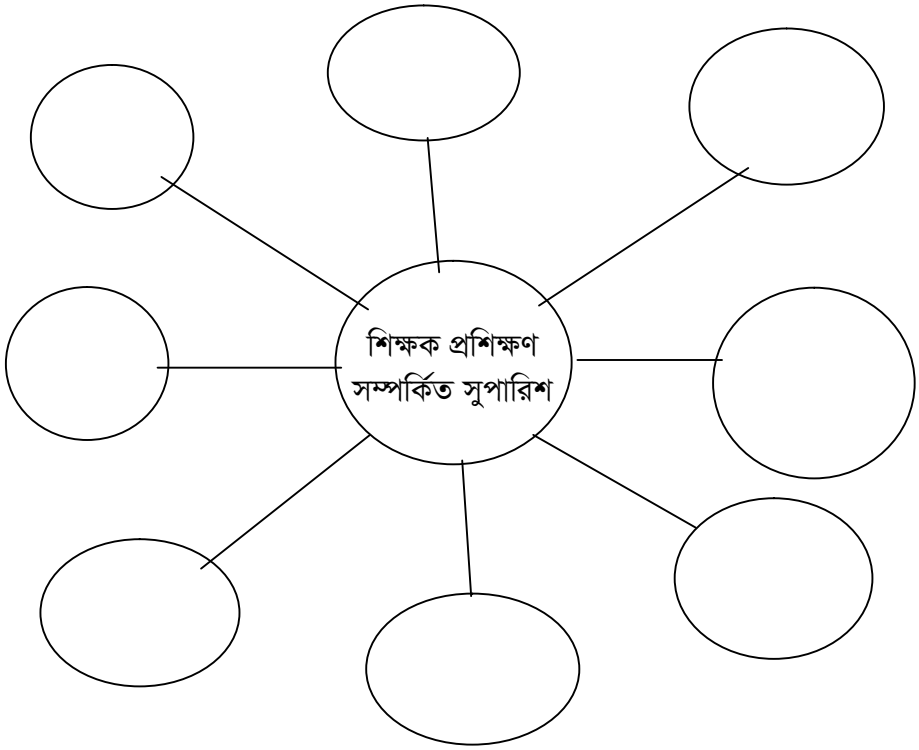

পর্ব-গঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬)-এর গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য

১৯৭৬ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি প্রথমে প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল-হক ও পরে প্রফেসর জিল্লুর রহমান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রথমে ৩৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হলেও পরে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫১-এ উন্নীত করা হয়। কমিটির দায়িত্বের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দান, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের নীতিমালা প্রণয়নে সহযোগিতা দান, বিভিন্ন উপ-কমিটির (১০) ও বিষয় কমিটির (২৭) কাজের সমন্বয়, তাঁদের প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রমকে সমন্বিত ও সুসামঞ্জস্য করার নিশ্চিতকরণ অন্যতম। প্রত্যেকটি উপ-কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের খসড়া চূড়ান্ত করে। জাতীয় কমিটি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন পূর্বক চূড়ান্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিম্নে বর্ণিত ছকে প্রশ্নের পাশের বক্সে দেয়া সংখ্যা থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে পাশের খালি বক্সে লিখুন।

প্রশ্ন	শব্দগুচ্ছ	সঠিক শব্দ
১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি কত সালে গঠিত হয়?	১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৮৬	
২. উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা কততে উন্নীত করা হয়েছিল?	৪১, ৫১, ৬১	
৩. কতটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল?	১৯, ১০, ১২	

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৭

মূল শিখনীয় বিষয়

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬)

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)

২৬ জুলাই ১৯৭২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সভাপতি ছিলেন। সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশন কুদরাত-ই-খুদা কমিশন নামে পরিচিত। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশনা এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলিয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এ কমিশন নিয়োগ করেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশন ৩০শে মে, ১৯৭৪ রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন।

কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর সংগঠন ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সংগঠনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর ধরে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যায়। নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা ও মাধ্যমিক স্ড়রের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই তিন/চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র সমন্বয় প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত। বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষা দেয়া হয়, সেখানে পরিবেশ বিচ্ছিন্ন। এই পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকে একটি ক্ষণস্থায়ী

ব্যবস্থা বলে মনে করে, ফলে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর সাথে তাদের মানসিক যোগসূত্র গভীরতা লাভ করে না। এই অবস্থার অবসানকল্পে বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষকে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম দশম শ্রেণী খোলার নির্দেশ দিতে হবে। এতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর চাপ নিরসনে নতুন মাধ্যমিক স্কুল খোলার ব্যয়ভার অনেকাংশে লাঘব হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকাংশের জন্য প্রান্তিক শিক্ষায় রূপান্তর

আমাদের দেশের বর্তমান (১৯৭২-৭৪) অবস্থার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে বাঞ্ছনীয় বলে কমিশন মনে করেন। কারণ হিসাবে কমিশন উল্লেখ করেন যে, নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে (অর্থাৎ বয়সসীমা ১৪ বছর থেকে ১৭ বছরের মধ্যে) প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের মত ছাত্রছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে এবং পুরোপুরিভাবে সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অথচ জীবিকা অর্জনে সহায়ক তেমন কোন প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ফলে অধিকাংশই ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজের জীবনধারায় আপন সংকীর্ণ ভূমিকা পালন করে যায়। যে কোন দেশের জন্য এ অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে কমিশন সুপারিশ করে ঃ

১. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা ও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণী এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে : (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (খ) সাধারণ শিক্ষা।

৩. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণীতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসাবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৪. দশম শ্রেণী শেষে উভয় ধারার শিক্ষার্থীরা বহি:পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। অপরপক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর বৃত্তি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনমত একাদশ শ্রেণীতে এক বছর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সম্পূর্ণতা লাভ করবে। একাদশ শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা একটি বহি:পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে।

৫. বৃত্তিমূলক দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনান্তে যারা শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক হিসাবে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য শিল্পে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রান্তিক শিক্ষা প্রাপ্ত এসব শিক্ষার্থী কর্মকুশল, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ জনশক্তি হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করে ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠালাভে সচেষ্ট হতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৬. কোন শিক্ষার্থী যদি দশম শ্রেণী কিংবা একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের পর সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে উচ্চ শিক্ষালাভে আগ্রহী হয় তবে সে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর সাধারণ শিক্ষালাভের পথও উন্মুক্ত থাকবে।

৭. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমের যে বিভাগ বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থী সেই বিভাগে একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পারবে। শিক্ষার্থী যদি একাদশ শ্রেণীর প্রশিক্ষণ লাভের পর সাধারণ শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করে তাহলে শিক্ষার্থীর একাদশ শ্রেণীর প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত শিক্ষায় পর্যবসিত হবে।

৮. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে লক্ষ্য হতে হবে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা বিশ ভাগকে প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা। পরবর্তী পরিকল্পনায় এ হারকে অন্ড়ত শতকরা পঞ্চাশভাগে উন্নীত করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা

মাধ্যমিক স্তরের এই শিক্ষা মূলত: প্রান্তিক শিক্ষা। সেজন্য নবম ও দশম শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের পরও একাদশ শ্রেণীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের চাহিদা এবং কর্মপ্রদান সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রান্তিক শিক্ষা লাভের পর মধ্যস্তরের জনশক্তিতে পরিণত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। প্রস্তাবিত এসব বৃত্তিমূলক কোর্স আরো একভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশের জনশক্তি কিংবা সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মকুশল করে তোলার উদ্দেশ্যে এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা স্কুলের রুটিন বহির্ভূত সময়ে তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হবে বটে কিন্তু শিক্ষার যে বৃহত্তম স্বার্থ তাতে সাধিত হবে তার তুলনায় এ ব্যয় নগণ্য।

মাধ্যমিক স্তরে প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা দূরূহ কাজ। আশা করা যাচ্ছে যে, এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়ে কর্মসংস্থান করে নেবে। এজন্য অবশ্য মূলধন প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ

ব্যক্তি সীমিত সম্পদের অধিকারী, সেজন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে, কিংবা তাদের কর্মকুশলতাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রয়োজন মতো সমবায় সংস্থা গঠন করতে হবে। সরকারী প্রচেষ্টায় এ দুটো ক্ষেত্রে সাহায্য পেলেই অনেকেই চাকুরি না খুঁজে আপন বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়াস পাবে এবং নিজের কর্মসংস্থান নিজেই সৃষ্টি করে নেবে।

বৃত্তিমুখীন শিক্ষার প্রসার ও তাকে জনপ্রিয় করার জন্য ভারতে কয়েক স্থানে ''শেখো ও উপার্জন করো'' প্রকল্পের মত আমাদের দেশেও অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করা উচিত হবে। প্রকল্পটির প্রচারের জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে এবং কাঁচামাল ক্রয় ও আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একটি আবর্তক তহবিল সৃষ্টি করতে হবে। নবম হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের কার্ড রাখা হবে যাতে কাজের পরিমাণ ও মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা সহজ হয়। তৈরি পণ্যের বাজারজাত করার জন্য একজন মার্কেটিং অফিসারের অধীনে বিক্রি কেন্দ্র খুলতে হবে। তদুপরি এসব পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকার সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দিবেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

১. জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত শিক্ষার উপর নির্ভশীল। বস্তুত শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহ উপকরণ ও অন্যান্য ব্যাপারে নিয়োজিত সম্পদ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি শিক্ষকের মান উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। দেশের শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নকল্পে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। উন্নত রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের যে সকল আধুনিক রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলোকে প্রয়োজনমত প্রয়োগ করে আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৭৬ সাল হতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলকরূপে চালু করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন তাদের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ

ক. ৪৭টি পি.টি.আই-তে দু-মাস মেয়াদী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। প্রতি পি.টি.আই বছরে পাঁচ বার (প্রতিবারে ৮৫ জন শিক্ষকের জন্য) এ কোর্সের আয়োজন করবে। এভাবে ৪৭টি পি.টি.আই-তে প্রায় এক লক্ষ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

খ. গ্রাজুয়েট শিক্ষকের জন্য অনুরূপ প্রশিক্ষণ কোর্স দেশের কলেজ অব এডুকেশন, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও একটি শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে চালু করতে হবে। দেশের ছয়টি কলেজ অব এডুকেশন, ছয়টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও একটি শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বছরে প্রায় পঁয়তালি-শ হাজার জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে।

গ. দেশের রিফ্রেসার কোর্স ট্রেনিং সেন্টারসমূহে এবং যে সকল নির্বাচিত স্কুলে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে সে সব প্রতিষ্ঠানেও জরুরিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৩. কিছু সংখ্যক নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষক-শিক্ষণ (নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী) কোর্স চালু করতে হবে।

৪. মাধ্যমিক স্ড়রের বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের শিক্ষক তৈরির জন্য দেশের সকল পেশাগত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের যে কোর্স চালু রয়েছে সেগুলোকে ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

৫. শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান পাঠ্যক্রমের সংস্কার করে যুযোপযোগী করে তুলতে হবে।

৬. বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের নিয়মিত পেশাগত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ঃ

ক. শুধু মহিলাদের জন্য কয়েকটি পি.টি.আই স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য পি.টি.আইগুলোতে তাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

খ. যেহেতু ঢাকা শহরে কোন পি.টি.আই নাই, সেহেতু এখানে একটি পি.টি.আই স্থাপন করা প্রয়োজন।

গ. পি.টি.আইগুলোর সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা এরূপভাবে বর্ধিত করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

ঘ. অনতিবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা বিভাগ চালু করে কালক্রমে একে একটি শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটে পরিণত করতে হবে।

ঙ. শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করতে হবে। এদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, ওয়ার্কশপসহ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৭. দেশের যে পাঁচটি জুনিয়র ট্রেনিং কলেজকে কলেজ অব এডুকেশন-এ রূপান্তরিত করে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রি শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে তাদের নানা সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির দশ মাস স্থায়ী বর্তমান কোর্সটি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বিধায় এর স্থলে ক্রমে ক্রমে তিন বছর মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা উচিত।

৮. প্রাইমারী স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ঃ

ক. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত এবং এদের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা।

খ. ইনস্টিটিউটগুলির শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন

গ. শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে থাকার ব্যবস্থা করা ও মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা।

ঘ. শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থাসহ অধিক সংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

ঙ. বর্তমান এক বৎসর মেয়াদী পি.টি.আই কোর্সকে দুই বছরে উন্নীত করা।

৯. উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য তিন বছর প্রাইমারী স্কুলে চাকুরীর পর বিএড কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া।

১০. বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবাঞ্ছিত অনুপাতের হার বিদ্যমান। অনুপাত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছাড়া ১:১৫ হওয়া উচিত।

১১. শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করা উচিত।

১২. শুধুমাত্র উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ন্যূনতম তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে এমএড কোর্সে এবং পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ডক্টরেট কোর্সে ভর্তি করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬)

১৯৭৬ সালে ''জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাবলী ও সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের জন্য **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি** গঠন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির গঠন

প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক ২৬/৫/৭৭ পর্যন্ড় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গাঠনিক পর্যায়ে ৩৫ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। পরে এই কমিটিকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করার উদ্দেশ্যে আরো কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে সংযোজন করে চূড়ান্ত পর্যায়ে কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৪৭ জনে উন্নীত করা হয়েছিল।

এই কমিটির দায়িত্ব ছিল –

- শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সকল শিক্ষাঙ্গনে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সম ধরনের উচ্চমান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়িত করার জন্য পরামর্শ দান।
- শিক্ষা কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুত করতে সাহায্যকরণ।
- বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়নকারী কমিটির নির্দেশের জন্য সাধারণ নীতিমালা প্রণয়নকরণ।
- বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নকারী কমিটিসমূহের প্রস্তাবাদি পরীক্ষাকরণ এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রমকে সমন্বিত ও সুসমঞ্জস্য করা নিশ্চিতকরণ।

উপ-কমিটি ও বিষয় কমিটি

স্তরভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কাজে সাহায্য করার জন্য কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি বিস্তৃত নীতিমালা রচনা করেন। এই নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিষয়ের জন্য নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে

১০টি উপকমিটি এবং ২৭টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিভিন্ন কমিটির কাজের মধ্যে সমন্বয় বিধান এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় কমিটিকে সাহায্য করার জন্য একটি নির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়েছিল। নির্বাহী কমিটিতে মোট নয় জন সদস্য ছিলেন। উপ-কমিটিগুলো হচেছ –

১. প্রাথমিক শিক্ষা
২. মাধ্যমিক শিক্ষা
৩. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
৪. বিজ্ঞান শিক্ষা
৫. মানবিক বিষয়
৬. সামাজিক বিজ্ঞান
৭. কারিগরি শিক্ষা
৮. মাদ্রাসা শিক্ষা
৯. শিক্ষক-প্রশিক্ষণ
১০. কৃষি শিক্ষা

কমিটির কার্যক্রমের নীতিমালা

যে সব নীতিমালার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি কাজ করেছিল সেগুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল–

১. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যেন নিশ্চিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা।

২. শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি স্তর ও বিষয়ের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যসূচি তৈরি করা।

৩. শিক্ষার্থীর বয়ঃস্তর ভেদে তার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ক্রমবিকশিত প্রবণতা ও চাহিদার প্রতি সচেতন থাকা।

৪. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে এবং একই স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের মান; পরিমাণ এবং প্রয়োজনের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করা।

৫. সোপান ভিত্তিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির গুরুত্ব নিশ্চিত করে আনুভূমিক রীতির অনুসরণে শিক্ষাক্রমে প্রসারতা সংগঠন করা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির উপর অর্পিত কাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল –

১. কর্মমুখী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি অবিচেছদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

২. প্রাথমিক স্ড়রে শিশুর কর্মমুখী শিক্ষার জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি, শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বিত রূপরেখা রচনা করা।

৩. নিম্নমাধ্যমিক স্তর থেকে কর্মমুখী শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রত্যেকটি উপ-কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং বিশদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যসূচির খসড়া চূড়ান্ত করে। এই চূড়ান্ত খসড়াসমূহ জাতীয় কমিটির ৮–১৩ অধিবেশনে একে একে উপস্থাপিত হয়। প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরিমার্জনের পর প্রত্যেক পর্যায়ের চূড়ান্ত পাঠ্যসূচি অনুমোদিত হয়। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক স্ড়রের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির রিপোর্ট পেশ করা হয়। এই রিপোর্টের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৭৮ সাল হতে ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীর জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ বিদ্যালয়ে চালু করা হয়। অনুরূপভাবে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রণীত রিপোর্ট যথাক্রমে ১৯৭৭ সালের আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে পেশ করা হয়। পরবর্তীতে এই পাঠ্যসূচি অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।

মূল্যায়নঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রান্তিক শিক্ষায় রূপান্তরের জন্য ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন যেসব সুপারিশ প্রদান করেছিলেন তা উল্লেখ করুন। এসব সুপারিশের মধ্যে কোনটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে?

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬) গঠনের পটভূমি ও এর কার্যাবলি বর্ণনা করুন। নতুন কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন পরবর্তী এ ধরনের কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ, কাজ-১

১. ১৯৭৬

২. ৫১

৩. ১০

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৮

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)

ভূমিকা

১৯৮৮ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন এর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশন ছাত্র-বেতন, বৃত্তি, শিক্ষক নিয়োগ, কর্মমুখী শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে একটি সময় উপযোগী সুপারিশমালা প্রদান করেছিলেন। কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিকসহ সকল স্তরের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সুপারিশ যথাযথ কার্যকরী না হওয়ায় ১৯৯৭ সালে প্রফেসর এম. শামসুল হক-এর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট পেশ করেন। কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ড. খুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আলোকে যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) এর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭) -এর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) -এর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ

মফিজ উদ্দীন শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ রেখেছিলেন। তার মধ্যে ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা,

ডিগ্রী পর্যায়ের কলেজগুলো থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া, প্রতি বিদ্যালয়ে হেলথ ক্লিনিক খোলা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর তিন বৎসরের বিএড কোর্স প্রবর্তন করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আসুন আমরা মফিজ উদ্দীন শিক্ষা কমিশনের নিম্ন বর্ণিত সুপারিশের কোন কোন সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়িত হয়নি লিখুন এবং আপনার মতে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ একবাক্যে লিখুন।

সুপারিশ	বাস্তবায়িত হয়েছে কী না	বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ
১। ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করা।		
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ১১-১২ শ্রেণী পর্যন্ত করা।		
৩। তিন বৎসরের বিএড কোর্স প্রবর্তন করা।		
৪। প্রতিটি বিদ্যালয়ে হেলথ ক্লিনিক চালু করা।		

পর্ব-খঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭) -এর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭) মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের তিনটি ধারা- সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছিলেন। তার মধ্যে চার বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা সকল

ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম, ক্লাস সাইজ, নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার মূল্যায়ন, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি, মাদ্রাসায় বৃত্তিমুলক শিক্ষার সংযোজন, মাদ্রাসা শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার মূল শিখনীয় বিষয়-এ জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমুলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সুপারিশসমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। পাঠ শেষে নিম্নের ছকটি পূরণ করুন।

সুপারিশ	**উত্তর**	**সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে কি? হাঁ অথবা না উল্লেখ করুন।**
১। চার বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা কোন শ্রেণী থেকে কোন শ্রেণী পর্যন্ত?		
২। সাধারণ, বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম কী রূপ হবে?		
৩। সাধারণ শিক্ষার জন্য ক্লাস সাইজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত উল্লেখ করুন।		
৪। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার স্তরের ক্লাস সাইজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত উল্লেখ করুন।		
৫। মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে কোন প্রতিষ্ঠান?		
৬। মাদ্রাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ি কত বৎসর করার সুপারিশ করেছিলেন?		

পর্ব-গঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, 'মূল শিখনীয় বিষয়'-এ উল্লিখিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি'র (১৯৯৭) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশগুলো পাঠ করুন। পাঠ শেষে 'কী (key) পয়েন্টের' মাধ্যমে নিম্নের ছকটি পূরণ করুন।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ

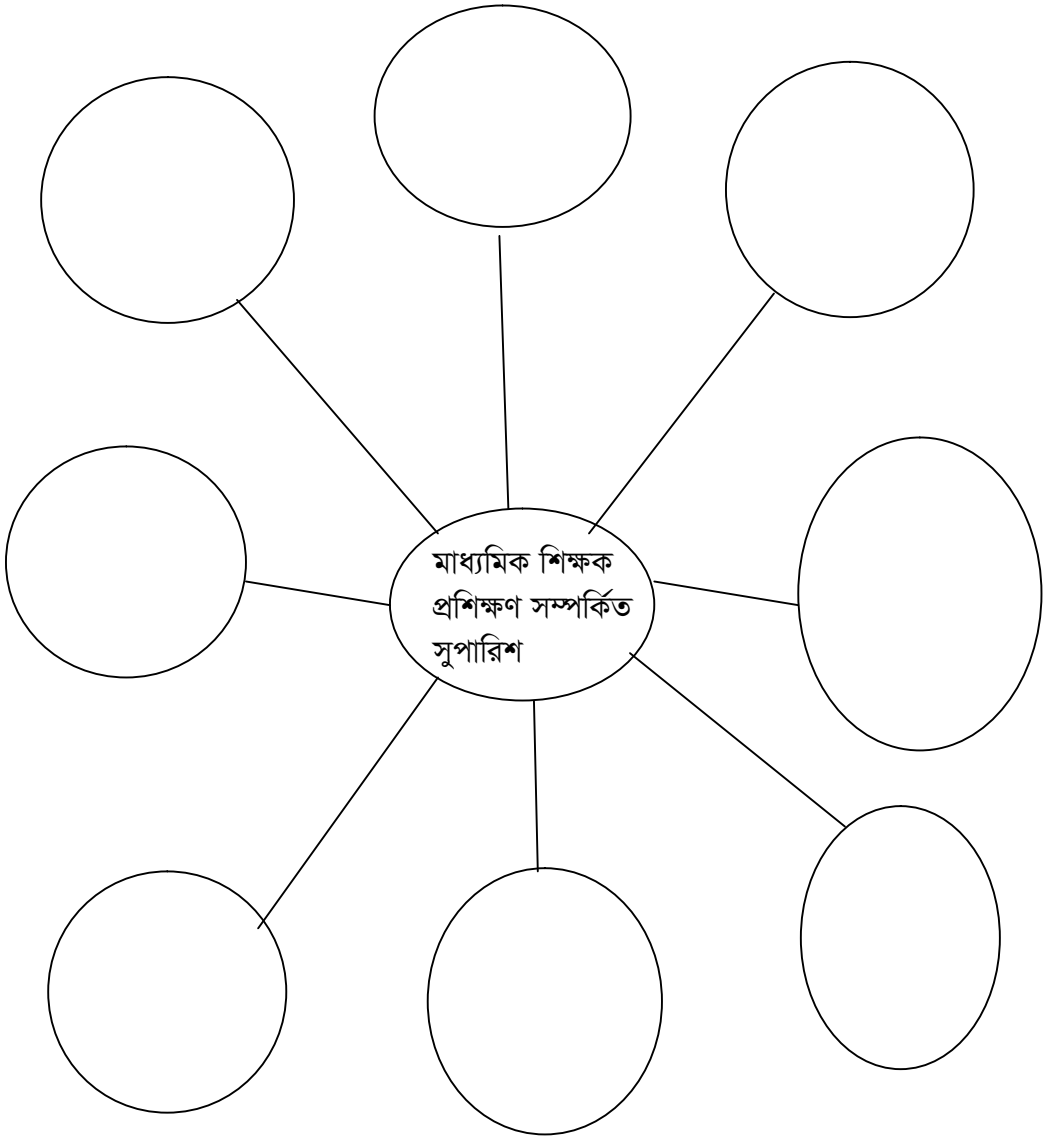

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৮

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮)

১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদ। মূলত কমিটিতে সদস্য ছিল ২৭ জন। কমিশন ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করে।

কমিশনের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ছিল :

- শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান (১৯৮৭ সাল) অবস্থা ও বিরাজমান পরিস্থিতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর, মাদ্রাসা, কারিগরি ও প্রকৌশল এবং চিকিৎসাসহ সকল স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ়, সময়োপযোগী, উৎপাদনমুখী ও অপচয়হীন করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন।

কমিশন সুপারিশমালা প্রণয়ন করার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করে সেগুলো হলো:

- ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পদ্ধতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা, ছাত্র বেতন, মাথাপিছু ব্যয় ও বৃত্তি, শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, গবেষণাকর্ম, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা, কর্মমুখী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শিক্ষার জন্য সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পদের সুষম বণ্টন, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও উন্নয়ন এবং প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয়।
- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সুদক্ষ মানবসম্পদ ও সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করে :

১. মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে প্রচলিত ধারায় অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দশম এবং একাদশ থেকে দ্বাদশ চলতে থাকবে। তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে ২০০০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করতে হবে।

২. বর্তমানে প্রচলিত যথাক্রমে নবম এবং দশম শ্রেণী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীগুলোর শেষে পরপর দুটি প্রান্তিক ও ফাইনাল পরীক্ষার স্থলে শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে একটি ফাইনাল (পাবলিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৩. ডিগ্রি কলেজগুলো থেকে একাদশ ও দ্বাদশ (উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা) শ্রেণীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৪. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ৫০% জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নিয়ে যেতে হবে।

৫. ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোর মধ্য থেকে অর্ধেক কলেজকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং অবশিষ্ট অর্ধেককে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

৬. মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সকল শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এ সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, পুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ও গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে হেলথ ক্লিনিক খুলতে হবে।

৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা জোরদার করতে হবে।

৯. ক্যাডেট কলেজ এবং জিলা স্কুলগুলোর উন্নতি সাধন এবং প্রয়োজনে সংখ্যা বৃদ্ধি করে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১০. প্রাইভেট টিউশন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর পরিবর্তে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকগণই কোচিং -এর ক্লাস করবেন এবং এই অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য পারিশ্রমিক পাবেন।

১১. সর্বস্তরে তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নরূপ সুপারিশ করে :

১. দাখিল ও আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালনা করবে।

২. পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করে যথাসম্ভব তা জেলা পর্যায়ে সীমিত করা সমীচীন।

৩. আলিম ও দাখিল মাদরাসাসমূহের জন্য গভর্ণিং বডি গঠন করা উচিত।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে হবে।

কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল সুপারিশ প্রদান করেছিলেন তা নিম্নরূপ :

১. মাধ্যমিক শিক্ষকদেরকে পূর্ণ এক বছর প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোকে নন-ভেকেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

২. প্রত্যেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে উচ্চ পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. বিজ্ঞান বিষয়ক স্কুল বিষয় যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বি এড প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহী করতে হবে।

৫. যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করতে হবে।

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কাজের সাথে বিভিন্ন গবেষণা কাজ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৭. উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর তিন বছরের বিএড কোর্স প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)

১৯৯৬ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রফেসর এম. শামসুল হক-এর নেতৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি ১৯টি উপ-কমিটির মাধ্যমে কাজ করে এবং ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রদান করে। কমিটির মূল দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ:

১. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদন গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করে একটি বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা।

২. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য যাবতীয় কার্যপদ্ধতি যথা- বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণ করা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

৩. প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করা।

৪. নীতিমালা প্রণয়নের জন্য অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কর্মকান্ড ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করে:

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এ স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে; না হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পথে যাবে। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মেধা ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, কর্মজগতের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা থাকবে - সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা। সব ধারাতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে এবং কয়েকটি সাধারণ আবশ্যিক

বিষয় থাকবে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী এক ধারা থেকে অন্য ধারায় গমনের পথ খোলা থাকবে।

সুপারিশ ঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে চার বছরের - নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

২. মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দাযিত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।

৩. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৫. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮. দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

৯. প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।

১০. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৪০।

১১. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।

১২. বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অফুরন্ত জনসম্পদকে বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত বলে কমিশন মতামত ব্যক্ত করে।

সুপারিশ ঃ

১. জাতীয় দক্ষতা মান তিন, দুই ও এক পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাক্রম (মাদরাসা শিক্ষাসহ) পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক করতে হবে। শিল্পকারখানা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে স্যান্ডুইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটসম্যান সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ডিপ্লোমা স্তরের সকল কারিগরি শিক্ষার মেয়াদ বর্তমানে প্রচলিত তিন বছর প্রাতিষ্ঠানিক এবং দুই মাস শিল্প কারখানা / মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির স্থলে তিন বছর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয় মাস শিল্প কারখানায় / মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তি করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং এ ধরনের অন্যান্য ইনস্টিটিউট -এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।

৪. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু রাখতে হবে।

৫. বৃত্তিমূলক, প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় দক্ষতা মানের বেসিক ট্রেড তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম গ্রেডের উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ১০ করতে হবে।

৭. সর্বস্তরে সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের

জন্য ভিটিটিআই ও টিটিসি -এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাদরাসা শিক্ষা

মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

১. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও কলাকৌশলে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি ৫ বছর, দাখিল ৫ বছর, আলিম ২ বছর, ফাযিল ২ বছর ও কামিল ২ বছর মেয়াদী। একে পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদায়ি ৮ বছর, দাখিল ২ বছর, আলিম ২ বছর, ফাযিল ৩/৪ বছর, কামিল ২/১ বছর মেয়াদী করতে হবে।

৩. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা ধারায়ও নারী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. মাদরাসা শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা, তবে ক্ষেত্রবিশেষে আরবি ভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে।

৫. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত মুল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায়ও অনুসরণ করতে হবে।

৬. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কলেজ / ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

৭. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগ ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নির্বাচিত মাদরাসাগুলোর জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. মাদরাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, পরিদর্শন, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে

সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

১০. মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষার সর্বস্তরে একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক পরিচালক (মাদরাসা) -এর পদ থাকবে। মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায় তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করা হবে। তবে মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে মানের সমতা নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্রসর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান, তাই আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না। উল্লিখিত সমস্যা দূরীকরণে কমিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেন :

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৩. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের কমপক্ষে তিন মাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে সে দুটি বিষয় ছাত্রজীবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষালাভ করেছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৮. সকল শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রতি ৫ বছর অন্তর সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরী বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. প্রশিক্ষণ কলেজ আরও বাড়াতে হবে এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদ শিক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলির উল্লেখ করুন। কোন কোন সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে উল্লেখ করুন।

২. জাতীয় শিক্ষা কমিটি (১৯৯৭) কর্তৃক সুপারিশকৃত মাধ্যমিক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশগুলো উল্লেখ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব–খ, কাজ-১

১. নবম থেকে দ্বাদশ	না
২. অভিন্ন হবে	না
৩. ১ঃ৪০	না
৪. ১ঃ১০	না
৫. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	হাঁ
৬. ৮ বৎসর	না

পর্ব-গ, কাজ-১

প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, দেশে-বিদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরী, প্রশিক্ষণ কলেজ বৃদ্ধি।

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৯

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪)

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া-এর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। যা বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশিন নামে পরিচিত। এ কমিশন ২০০৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এক রিপোর্ট পেশ করেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪) গঠন এবং এই কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪) গঠন এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে ২৪ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিতে ১২টি উপ-কমিটি কাজ করে। শিক্ষা কমিশন (২০০৪) বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যেসব বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছিলেন তা হলো - মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা, মুক্তচিন্তা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন এবং দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আর কী অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে আপনি মনে করেন। এরূপ দুটি উদ্দেশ্য লিখুন এবং কেন এক / দুই বাক্যে ব্যাখ্যা করুন।

উদ্দেশ্য	ব্যাখ্যা
১.	১.
২.	২.

পর্ব-খঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশ

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, শিক্ষানীতি ও প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছিলেন।

কাজ-১

নিম্নে বর্ণিত 'মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্র' থেকে বাছাই করে ছকে প্রদত্ত ৫টি গ্রুপে বিভক্ত করুন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্র

সাধারণ, মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক
শিক্ষা ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম,
পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের, সকল শিক্ষকের
প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের নিয়োগ, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে
দুর্নীতিমুক্তকরণ, নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থাকরণ, বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক
উপদেষ্টা নিয়োগ, এক হাজার শিক্ষার্থীর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক উপাধ্যক্ষ
নিয়োগ, দশম শ্রেণীর পর বহি: পরীক্ষা, শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০, দরিদ্র ও মেধাবী
শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে প্রশ্ন প্রণয়ন শাখা
রাখা,শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর নম্বর তিন বৎসর
সংরক্ষণ, উপজেলায় আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা, স্কুল ভিত্তিক মুল্যায়ন

শিক্ষক	শিক্ষাক্রম	শিক্ষানীতি ও প্রশাসন	প্রশিক্ষণ	পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পর্ব-গঃ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, মূল শিখনীয় বিষয়ের মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশের অংশটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। পাঠ শেষে 'কী (key) পয়েন্টের' মাধ্যমে নিম্নের মাইন্ড মাপিংটি তৈরি করুন।

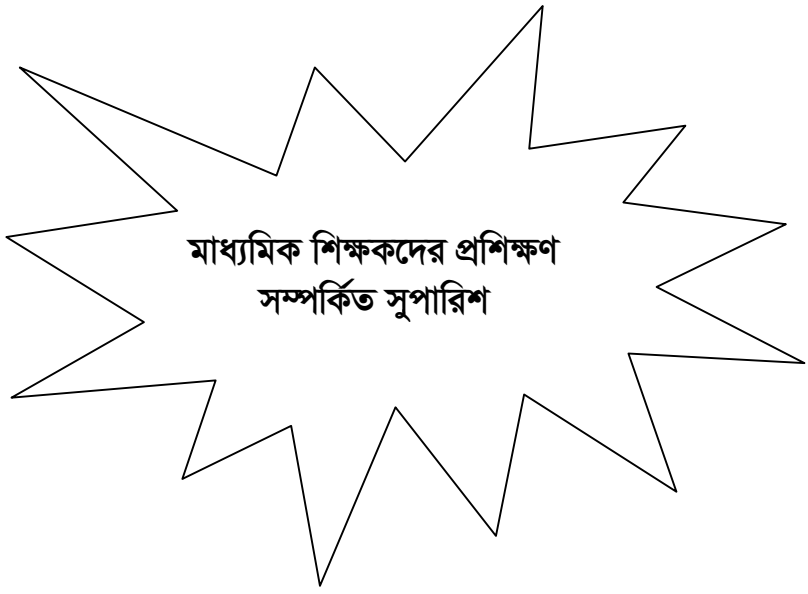

ইউনিট-৪ অধিবেশন-৯

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালের ২১শে অক্টোবর মন্ত্রী সভার এক বৈঠকে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাবলি চিহ্নিত করে এর উন্নতিকল্পে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এ শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া। সরকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে ১৫ই জানুয়ারি ২০০৩ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারের কমিশন গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানায়। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল চেয়ারম্যানসহ ২৪ জন। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ১২টি উপ-কমিটি কাজ করে। উপ-কমিটিগুলোর রিপোর্টের আলোকে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান মার্চ ২০০৪-এ রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের সাংস্কৃতিক ও সামগ্রিক পরিবেশ এবং আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে নির্ধারণ করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. **প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।**

২. **শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।**

৩. **সুষম সামাজিক ও নাগরিক বিকাশের জন্য ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা।**

৪. **শিক্ষার্থীকে নিজ মেধা, প্রবণতা ও সৃজনশীলতা অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা এবং সৃজনশীলতাকে সচেতনভাবে লালনের ব্যবস্থা করা।**

৫. শিক্ষাকে জীবন ও কর্মমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষায় মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তা ও জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো।

৭. দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মানের সৎ, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

৮. মানবিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সাংস্কৃতিক, মানবিক, শারীরিক ও সৌন্দর্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করা।

৯. আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দেশ-বিদেশের ও মানব সভ্যতার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের ভূগোল, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রভৃতি সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশ

উপরে উল্লেখিত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করেন :

১. সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত বিষয়ে (core subject) অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পালন করবে। প্রকাশনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারীকরণ করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশ

৩. বর্তমান উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা সকল সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য।

৪. (ক) সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) এই স্তরের শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত এবং কার্যকর করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচন ও বাছাইয়ের সুপারিশ করবে।

৫. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

৯. বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০০ (এক হাজার)-এর বেশি হলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য দুজন অথবা আরও বেশি সংখ্যক উপাধ্যক্ষ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে ততোধিক উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যেতে পারে।

১০. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

১১. (ক) দশম শ্রেণীর পর একটি বহি:পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে এস এস সি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে আন্ত:পরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে। পরীক্ষার মুল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

(খ) বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই স্কুলভিত্তিক মুল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারি আদেশ জারি করেছে। এই ব্যবস্থায় বহি:পরীক্ষার শতকরা ৩০ ভাগ নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে। কমিশনের বিবেচনায় প্রথম কয়েক বছর পরীক্ষামূলকভাবে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শতকরা ২৫ নম্বর বরাদ্দ রাখা শ্রেয়। তবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য তা বর্ধিত করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ এবং স্কুলসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। স্কুলসমূহে অবিলম্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সরবরাহও নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) কোন শিক্ষার্থী এস এস সি পরীক্ষায় একবারে উত্তীর্ণ হতে না পারলেও যে সব বিষয়ে সে পাশ করবে, সেসব বিষয়ের নম্বর তিন বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে; ঐ সময়ে সে কেবল যে সব বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ঐ সব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগ লাভ করবে। স্কুল প্রধান কোন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলেও তার পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, যে সব বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হয় না অথচ ছাত্র-ছাত্রীরা অনুশীলন করে সে সব বিষয়ের অর্জন এবং স্কুলের আচরণ সম্বলিত সার্টিফিকেট দিবেন যাতে সে তার উপযোগী পেশায় কাজ করবার সুযোগ করতে পারে।

১২. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ অনুপাত হবে ১:৪০।

১৩. শিক্ষার মাধ্যমে হবে বাংলা। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে সকল শিক্ষার্থীকে বাংলা এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

১৫. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. (ক) সরকারের নির্ধারিত স্তরের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে অথবা মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সরকারের শিক্ষাখাত থেকে অর্থ বরাদ্দ পাবে না।

(খ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, শিক্ষকের বেতন, ছাত্র বেতন একটি নির্দিষ্ট নীতিকাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

১৭. বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছেন। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মাধ্যমিক স্তরের মুল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশ্নপ্রণয়নের জন্য একটি শাখা থাকবে। এই শাখা প্রশ্নপ্রণয়ন ছাড়াও প্রশ্নপ্রণেতাদের এবং প্রশ্ন মডারেটরগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে শিক্ষাবোর্ডগুলিকে একাডেমিক সহায়তা প্রদান করবে।

১৯. শিক্ষার সুযোগ বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্দেশ্যে প্রতি উপজেলায় একটি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) স্থাপন করতে হবে। গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাকে লালন করার উদ্দেশ্যে এ সকল বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি এবং আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের Constituent কলেজরূপে তাদের পূর্ব অবস্থানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ

১. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রত্যেক টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় অনুমোদন বাতিল করতে হবে।

২. প্রত্যেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকতে হবে।

৩. প্রত্যেক কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (সরকারি/বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো অনুসারে) শিক্ষক থাকতে হবে।

৪. টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং পেডাগজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।

৫. প্রশিক্ষকদের প্রতি ৫ বছরে একবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. উন্নত দেশের সাথে যোগাযোগ, শিক্ষা-বিনিময় বা অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়নে প্রশিক্ষক ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮. প্রতিটি কলেজে অনুশীলনী পাঠদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. গ্রন্থাগারে আধুনিক পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা সরকারিভাবে করতে হবে।

১০. বিজ্ঞানাগারে যথাযথ ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত অর্থ সংস্থান করতে হবে।

১১. সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজে ধরে রাখার জন্য বর্তমান জনবল কাঠামো বিন্যাস করে উর্ধ্বতন পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. প্রত্যেকটি কলেজে যথাযথ পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে যেভাবে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটছে তদ্রূপ নীতিতে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

১৪. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড প্রোগ্রামের কার্যকর অনুশীলনী পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে নায়েমের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৬. বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য আর কোন কলেজেকে নতুনভাবে অধিভুক্তি দেয়া নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দূরশিক্ষণের ব্যবহার করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪) কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করুন।

২. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (২০০৪) মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যেসব সুপারিশ প্রদান করেছিলেন তা উল্লেখ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ, কাজ-১

শিক্ষক	শিক্ষাক্রম	শিক্ষানীতি ও প্রশাসন	প্রশিক্ষণ	পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৪০	সাধারণ, মাদরাসা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম শিক্ষার মাধ্যম বাংলা	পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে দুর্নীতি মুক্তকরণ, নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থাকরণ, বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপদেষ্টা নিয়োগ, এক হাজার শিক্ষার্থীর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক উপাধ্যক্ষ নিয়োগ, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে প্রশ্নশাখা রাখা, উপজেলায় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন	সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ	দশম শ্রেণীর পর বহি:পরীক্ষা, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর নম্বর তিন বৎসর সংরক্ষণ, স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন

পর্ব-গ, কাজ-১

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষায় ডিগ্রীধারী শিক্ষক, প্রশিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে প্রশিক্ষকদের সম্পৃক্তকরণ, উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, প্রশিক্ষণ কলেজে জনবল কাঠামোর বিন্যাস, নিয়মিত কলেজ পরিদর্শন, দূর শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ।